বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা
প্রফেসর গীতাঞ্জলি বড়ুয়া
ড. শান্টু বড়ুয়া
ড. জগন্নাথ বড়ুয়া
শ্যামল বড়ুয়া
জুলিয়া বড়ুয়া চৌধুরী
মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
মোহা: মোমিনুল হক

শিল্প নির্দেশনা
হাশেম খান

ছবি ও অলংকরণ
মংপু মারমা
তাসনীমা ইসলাম

প্রথম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০২৫

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করাও এই স্তরের শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান অনুসরণ ও উন্নত বিশ্বের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অংশীজনদের চাহিদা ও মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ ২০২৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহ ইতোমধ্যে পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল ও ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটির প্রতি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশে সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

পঞ্চম শ্রেণির 'বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণিতে সাধারণত দশ বছরের অধিক বয়সের শিশুরা পাঠগ্রহণ করে। বয়সের কথা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তকে শিখন বিষয়ের উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে যেন সক্ষম হয়, সে চেষ্টা করা হয়েছে। পাঁচটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকেই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্তকরণ ও সমন্বয় কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, চিত্রশিল্পী এবং ইনডিজাইনারসহ যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্তকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

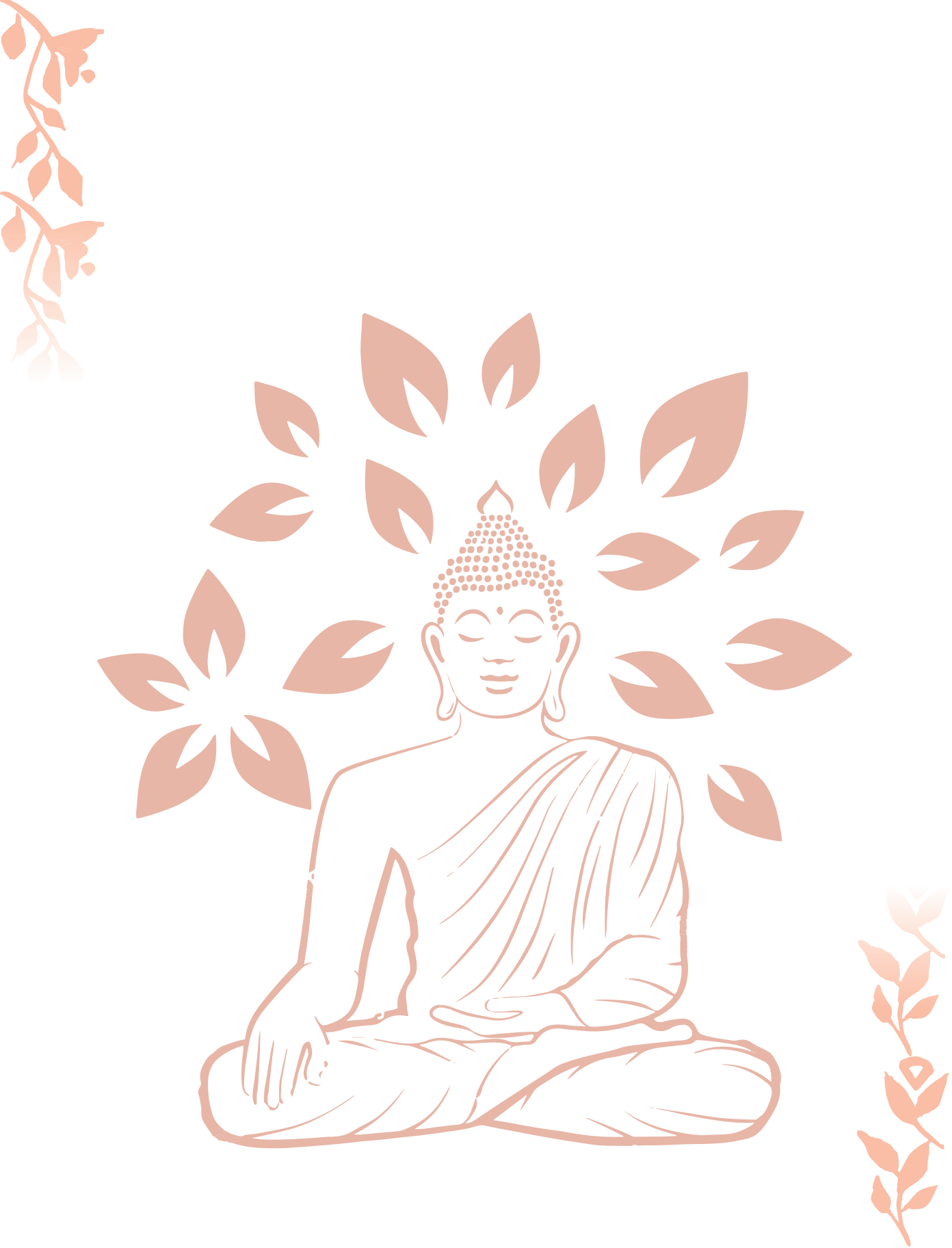

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন ও শিক্ষা	০১ - ২৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	আদর্শ জীবনচরিত	৩০ - ৪০
তৃতীয় অধ্যায়	দশশীল, দান ও কর্মফল	৪১ - ৬৪
চতুর্থ অধ্যায়	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও মহাতীর্থ	৬৫ - ৮২
পঞ্চম অধ্যায়	জাতকে জীব ও প্রকৃতি	৮৩ - ৯৮

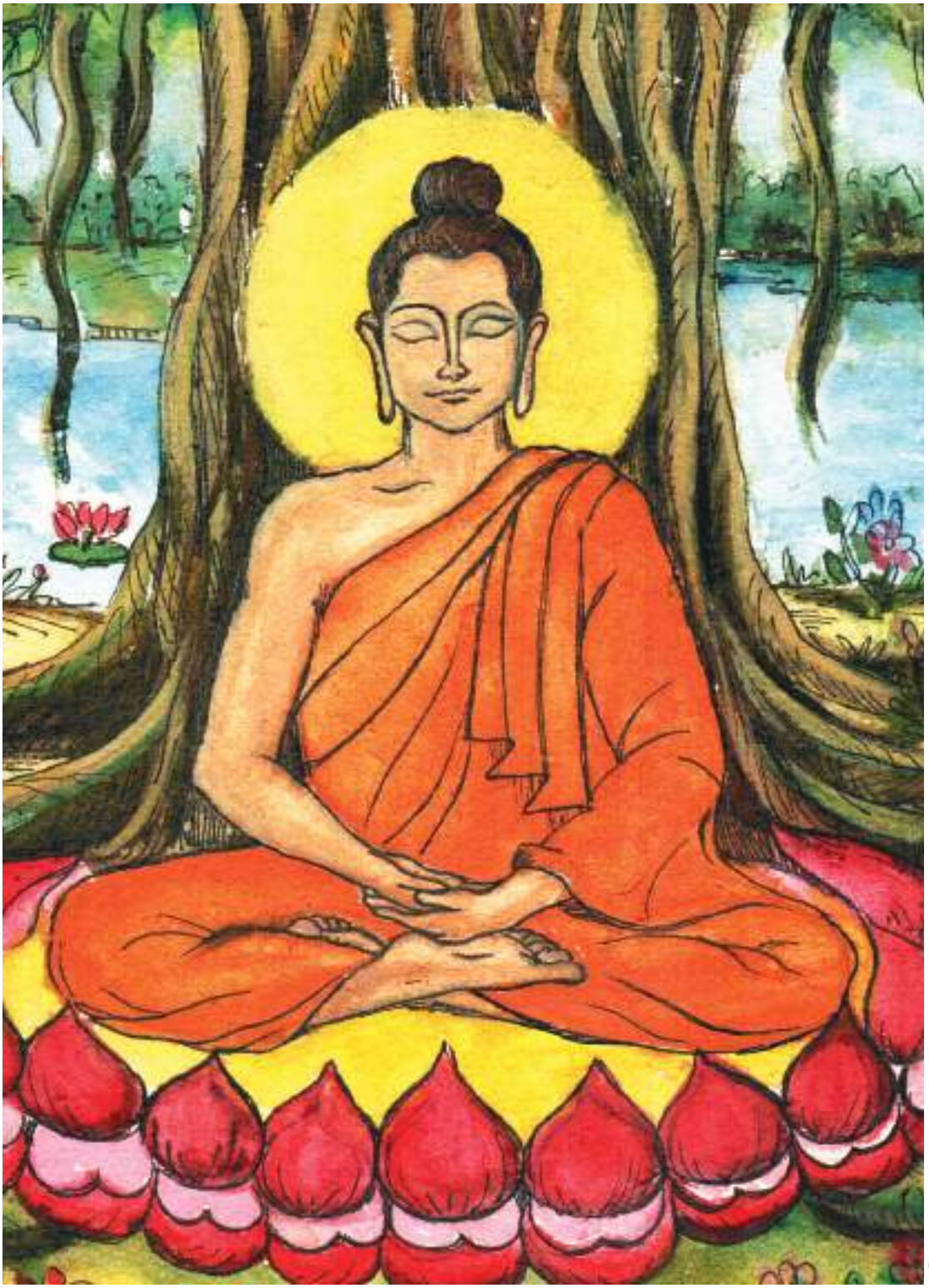

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন ও শিক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন

এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে যা আছে -

- গৌতম বুদ্ধের বংশ পরিচয়
- গৌতম বুদ্ধের জীবন ও কর্ম
- চতুরার্য সত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ
- গৌতম বুদ্ধের অন্তিম জীবন

সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম ও বংশ পরিচয়

মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করলে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। তোমরা কি এ রকম কোনো মহাপুরুষের কথা জান? দলে আলোচনা করে কয়েকজন মহাপুরুষের নাম ও পরিচয় লেখো।

ক্রমিক নং	নাম	পরিচয়
১.		
২.		
৩.		

আমরা এখন সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মের ছবিটি দেখব।

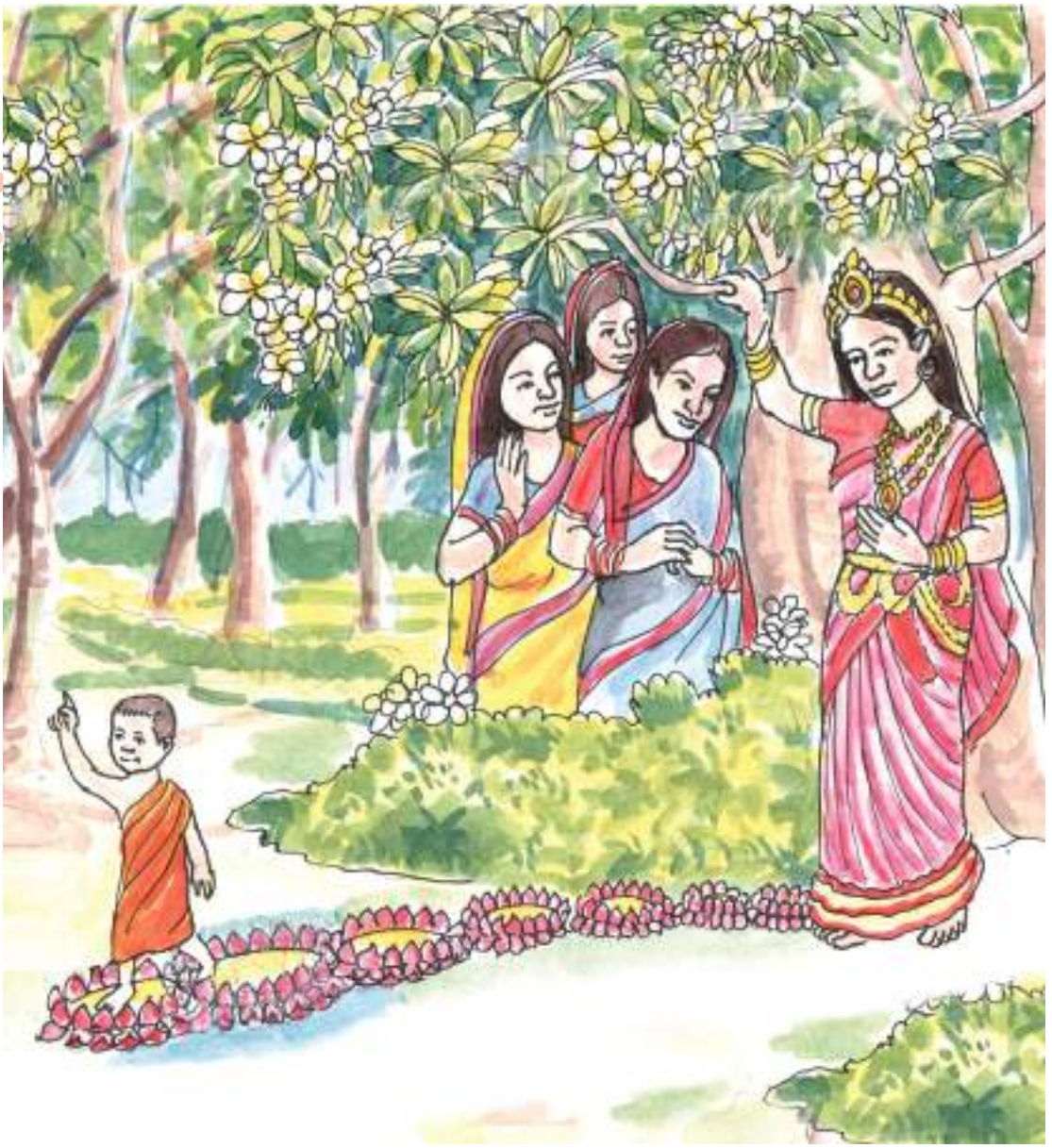

চিত্র ১: লুম্বিনী কাননে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম

এছাড়াও তোমরা গুগল বা ইউটিউব থেকে ‘সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম ও বংশ পরিচয়’ সম্পর্কিত ভিডিয়ো দেখতে পারো। স্ক্যান বা সার্চ করার সময় প্রয়োজনে পিতা-মাতা বা পরিবারের অন্য কোনো সদস্য, শিক্ষক বা ধর্মগুরুর সহায়তা নিতে পারো।

উপরের ছবিটি দেখে এবং পূর্বজ্ঞান অনুযায়ী ‘সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম ও বংশ পরিচয়’ সম্পর্কে কী জেনেছো, তা নিচের তথ্যছকে লেখো।

নাম :

পিতা :

মাতা :

জন্মস্থান :

বংশ :

আজ এ পাঠে আমরা বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে জানবো।

চিত্র ২: সিদ্ধার্থ গৌতমের নামকরণ ও ভবিষ্যৎ গণনা

আড়াই হাজার বছরেরও আগের কথা। হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের অন্তর্গত কপিলাবস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। সে রাজ্যে শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয়রা রাজত্ব করতেন। সে সময় এ রাজ্যের রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন এবং রানি ছিলেন মহামায়া। দীর্ঘদিন তারা নিঃসন্তান ছিলেন। অবশেষে নানা দান ও পুণ্য কর্মের ফলে রানি সন্তানসম্ভবা হলেন। সন্তান প্রসবের পূর্বে রানি মহামায়ার পিতার বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছে হলো। রাজা শুদ্ধোদনের অনুমতি নিয়ে রানি মহামায়া শুভ বৈশাখী পূর্ণিমার দিন পিতার বাড়ি দেবদহ নগরে যাচ্ছিলেন। রানি কিছুদূর গিয়ে লুম্বিনী উদ্যানে উপস্থিত হলেন। এমন সময় রানির প্রসব

বেদনা উঠলে লুম্বিনী উদ্যানেই এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। বহুদিন পর রাজা-রানির মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় নবজাতকের নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ। শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করায় অমাত্য ও প্রজাগণ নাম রাখলেন শাক্যসিংহ। রাজা শুদ্ধোদন রাজপুরোহিত ও জ্যোতিষীদের আহ্বান করে সিদ্ধার্থের ভবিষ্যৎ গণনা করলেন। জ্যোতিষীদের কথা শুনে রাজা চিন্তিত হলেন।

সিদ্ধার্থের জন্মের সাত দিন পর মাতা মায়াদেবী মৃত্যুবরণ করেন। রাজকুমার তাঁর মাসি ও বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী কর্তৃক লালিত-পালিত হয়েছিলেন বলে তাঁর আর এক নাম গৌতম। বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত হন।

বিদ্যাশিক্ষা

চিত্র ৩: রাজপুত্র সিদ্ধার্থের বিদ্যাশিক্ষা

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বাল্যকালেই কুমার সিদ্ধার্থকে বিভিন্ন বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করা হয়। বিশ্বামিত্র ছিলেন কুমার সিদ্ধার্থের শিক্ষাগুরু। অল্প দিনের মধ্যে তিনি চৌষট্টি রকমের বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। এ সময় ত্রিবেদ, সাংখ্য, যোগ, জ্যোতিষশাস্ত্র, রাজনীতি, সমরনীতি, তর্কশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, ব্যাকরণ, দর্শনসহ নানা শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়াও তিনি অশ্বচালনা, রথচালনা, ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন।

জীবে দয়া

রাজা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থকে সাথে নিয়ে একদিন হলকর্ষণ উৎসবে যান। সবাই উৎসবের আনন্দে মুখর। উৎসবে কৃষকদের হালচাষের কারণে মাটির ভেতর থেকে অনেক পোকামাকড় উঠছিল। কয়েকটি ব্যাঙ সে পোকামাকড় খাচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে রাজকুমারের মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হলো। নিরীহ প্রাণীর প্রতি রাজকুমারের মনে করুণা উৎপন্ন হলো। এ দৃশ্য দেখে রাজকুমার সিদ্ধার্থ জম্বুবৃক্ষের নিচে বসে জীবের দুঃখের কথা ভাবতে লাগলেন।

ছোটোবেলা থেকে বালক সিদ্ধার্থের মধ্যে কোন চঞ্চলতা ছিল না। সব সময় নির্জনে বসে কী যেন ভাবতেন। এক বিকেলে সিদ্ধার্থ নির্জনে বাগানে বসে ভাবছিলেন। এমন সময় আকাশে উড়ন্ত এক ঝাঁক রাজহাঁস থেকে একটি হাঁস তিরবিদ্ধ হয়ে তাঁর সামনে এসে পড়ল। সিদ্ধার্থ গৌতম হাঁসের বুক থেকে তিরটি বের করে নিলেন এবং হাঁসটিকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তুললেন।

এমন সময় সিদ্ধার্থের মামাতো ভাই দেবদত্ত তির-ধনুকসহ তাঁর সামনে এসে সিদ্ধার্থকে বলল, 'হে সিদ্ধার্থ! এ হাঁসটি আমার। হাঁসটি আমায় দিয়ে দাও।' তখন সিদ্ধার্থ গৌতম বললেন, 'ভাই দেবদত্ত, তুমি প্রাণহরণকারী, তাই কখনো হাঁসটিকে পেতে পারো না, প্রাণদাতাই হাঁসের একমাত্র অধিকারী।' তবুও দেবদত্ত হাঁসটি তার শিকার করা দাবি করলে সিদ্ধার্থ তখন বললেন, আমি শাক্যরাজ্য তোমাকে দিয়ে দিতে পারি। তবুও এ হাঁসটি তোমায় দেব না।' কুমার সিদ্ধার্থ হাঁসটিকে সুস্থ করে আকাশে উড়িয়ে দিলেন। মুক্তি পেয়ে হাঁসটি মহানন্দে প্যাক প্যাক শব্দ করতে করতে আকাশে উড়ে গেল।

চিত্র ৪: সিদ্ধার্থের কাছে দেবদত্ত রাজহংসের অধিকার দাবি করছে

সিদ্ধার্থ গৌতম কৈশোরকাল অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেন। তিনি সব সময় নির্জনে বসে চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। রাজা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থ গৌতমকে হাসি-খুশি ও আনন্দে রাখার জন্য যশোধরা নামে এক ক্ষত্রিয় কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করান; কিন্তু এতেও সিদ্ধার্থের মন সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হলো না। জীবের দুঃখ কীভাবে দূর করা যায়, নীরবে বসে তা-ই শুধু ভাবতেন।

সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণ ও চারি নিমিত্ত দর্শন

রাজা সব সময় রাজকুমার সিদ্ধার্থকে নিয়ে চিন্তা করতেন। কুমারের বয়স যখন ঊনত্রিশ বছর তখন তিনি নগর ভ্রমণে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। রাজা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণে যাওয়ার সকল ব্যবস্থা করলেন। একই সঙ্গে সকল প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও নিলেন।

একদিন সিদ্ধার্থ গৌতম সারথি ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে নগর ভ্রমণে বের হলেন। প্রথম দিন পূর্ব দিকে যাত্রা করলেন। পথে দেখলেন লাঠির উপর ভর দিয়ে হাঁটছে, হাত, পা, চামড়া কুঁচকানো এক বৃদ্ধলোক। দ্বিতীয় দিন দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন। দেখলেন যন্ত্রণাকাতর ব্যাধিগ্রস্ত এক লোক। তৃতীয় দিন পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন। দেখলেন চারজন লোক কাঁধে করে একটি মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে। এসব দুঃখের ঘটনা দেখে তাঁর মন খারাপ হলো। চতুর্থ দিন উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। পথে দেখলেন, শান্ত, সৌম্য, সংসার ত্যাগী গেরুয়া বসনধারী এক সন্ন্যাসী। এই দৃশ্য দেখে তিনি ভাবলেন বার্ধক্য, জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর হাত হতে রক্ষার জন্য সন্ন্যাস ধর্মই গ্রহণ করা উচিত। তাই তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিনই গৃহত্যাগ করবেন বলে সংকল্প গ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থ নগর ভ্রমণে গিয়ে চার দিনে যে চারটি ঘটনা দেখেন, তা বৌদ্ধধর্মে চার নিমিত্ত দর্শন নামে অভিহিত।

চিত্র ৫: সিদ্ধার্থের চারি নিমিত্ত দর্শন

একক কাজ: উপরের চিত্র থেকে সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণের সময় দেখা চার নিমিত্তগুলো লেখো-

ক্রমিক নং	নিমিত্ত
১	
২	
৩	
৪	

ধারণা চিত্র: সিদ্ধার্থের দেখা নিমিত্ত দিয়ে খালি ঘর পূরণ করো–

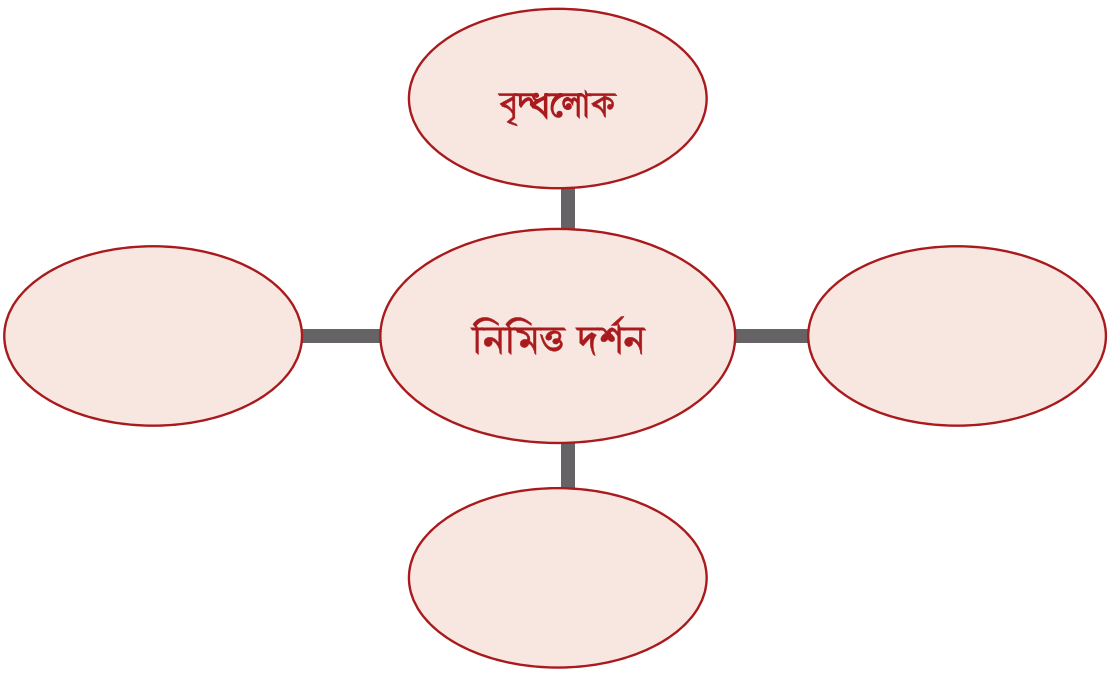

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ ও মার বিজয়

দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের জন্য সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেছিলেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি গৃহত্যাগ করেন। সেরাতে স্ত্রী যশোধরা নবজাতক পুত্র রাহুলকে নিয়ে সোনার পালঙ্কে ঘুমাচ্ছেন। এমন সময় সিদ্ধার্থ গৌতম সারথি ছন্দককে ডেকে কন্থক নামক অশ্বকে সাজিয়ে আনতে আদেশ দিলেন। সারথি

ছন্দক কন্থককে সাজিয়ে আনল। তখন সিদ্ধার্থ গৌতম যশোধরার শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। নবজাতক শিশুকে একপলক দর্শন করে গৃহত্যাগ করলেন।

চিত্র ৬: সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগ

সিদ্ধার্থ গৌতম ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে অনোমা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। অশ্ব হতে নেমে সিদ্ধার্থ গৌতম তলোয়ার দিয়ে মাথার চুল কাটলেন। সেই চুল আকাশে উড়িয়ে দিলেন। এরপর সিদ্ধার্থ গৌতম নিজ দেহ হতে সমস্ত রাজকীয় পোশাক খুলে ফেললেন। পোশাকগুলো ছন্দককে দিয়ে নগরে ফিরে যেতে বললেন। ছন্দক কপিলাবস্তু নগরে ফিরে এলো। রাজকুমার সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের সংবাদ সকলকে জানাল। রাজা, রানি ও নগরবাসী গৃহত্যাগের কথা শুনে কান্নাকাটি শুরু করলেন।

তারপর সিদ্ধার্থ গৌতম ঋষি আলাড় কালামের আশ্রমে গেলেন। পরে রাজগৃহের ঋষি রামপুত্র রুদ্রকের আশ্রমে গমন করেন। উভয় স্থানে কিছুদিন সাধনা করেন। তাঁদের দেখানো সাধনায় দুঃখ মুক্তি সম্ভব নয় বুঝতে পারলেন। তাই নিজে নিজেই ধ্যান সাধনা করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরপর সিদ্ধার্থ গৌতম সাধনা করার উদ্দেশ্যে গয়ার অদূরে পাহাড়ের গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। অনাহারে শরীরের রক্ত-মাংস শুকিয়ে গেল। শরীর দুর্বল হয়ে গেল। কঠোর সাধনা করতে হলে শরীরের সুস্থতা প্রয়োজন। তিনি বুঝলেন- না খেয়ে একটানা সাধনা করা অথবা অতিরিক্ত খাওয়া, কোনটাই দুঃখ থেকে মুক্তি লাভে সহায়ক নয়। তাই তিনি মধ্যম পথ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

দুর্বল দেহ নিয়ে সিদ্ধার্থ গৌতম সেনানী নামক গ্রামে উপস্থিত হলেন। একটি বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে আসন পেতে বসলেন। এমন সময় সেনানী গ্রামের কুলবধূ সুজাতা স্বর্ণ থালায় পায়সান্ন নিয়ে সিদ্ধার্থ গৌতমের হাতে তুলে দিলেন। সিদ্ধার্থ গৌতম পায়সান্ন আহার করে নিরঞ্জনা নদীতে স্নান করেন। তারপর উরুবিল্ল গ্রামে গমন করেন। সেখানে উন্মুক্ত স্থানে একটি বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। সে বৃক্ষের নিচে পূর্বমুখী হয়ে বজ্রাসনে বসলেন। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। তিনি বজ্রাসনে বসে সংকল্প গ্রহণ করলেন– 'এ আসনে আমার শরীর শুকিয়ে যাক, ত্বক-অস্থি-মাংস বিনষ্ট হোক, তথাপি দুর্লভ বোধিজ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত এ আসন ছেড়ে উঠব না।' এমন সময় পাপমতি মার ভীষণ আকৃতি ধারণ করে সিদ্ধার্থের সামনে এলো। সহস্র হস্তে অস্ত্র নিয়ে সিদ্ধার্থকে আক্রমণ করল। তাঁকে লক্ষ্য করে উত্তপ্ত শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করল; কিন্তু দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ সিদ্ধার্থ গৌতম আসন ছেড়ে উঠলেন না। তখন পাপমতি মার আপন যুবতি কন্যা রতি, আরতি ও তৃষ্ণাকে সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য পাঠালেন। মার কন্যারা বিভিন্নভাবে সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করার চেষ্টা করলেন; কিন্তু তিনি সাধনায় স্থির রইলেন। অবশেষে পাপমতি মার ও তার কন্যারা ব্যর্থ হয়ে সিদ্ধার্থের সামনে থেকে চলে গেল।

চিত্র ৭: সিদ্ধার্থ গৌতমের ধ্যান ভঙ্গের চেষ্টা করছে ভয়ংকর মার ও তার কন্যারা

বুদ্ধত্ব লাভ ও ধর্মপ্রচার

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। সিদ্ধার্থ গৌতম গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। এদিকে বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিম আকাশে অস্ত যাচ্ছিল। রাত্রির প্রথম যাম, দ্বিতীয় যাম পার হয়ে গেল। তৃতীয় যামে সিদ্ধার্থ গৌতম সর্ব তৃষ্ণাক্ষয় করে বোধিজ্ঞান লাভ করে জগতে বুদ্ধ হন। তিনি বুঝলেন, তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ। তৃষ্ণার মূল ছেদন করতে পারলেই পরম সুখ নির্বাণ লাভ সম্ভব। তিনি বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বুদ্ধত্ব লাভ করে বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। যে স্থানে বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হন, সে স্থানটি বুদ্ধগয়া নামে পরিচিত।

বুদ্ধ হওয়ার পর তিনি চিন্তা করলেন, আমি যে ধর্ম লাভ করেছি তা অতি গভীর, দুর্বোধ্য, জ্ঞানীগণ ব্যতীত সাধারণ মানুষ এ ধর্ম বুঝবে না। এ কারণে ধর্মপ্রচার করবেন না বলে সংকল্প গ্রহণ করলেন। সে সময় ব্রহ্মা প্রার্থনা করলেন, হে ভগবান বুদ্ধ আপনি ধর্মপ্রচার করুন। অনেকে আপনার সাধনালব্ধ ধর্ম বুঝবে।

তখন তথাগত বুদ্ধ প্রথম কার নিকট ধর্মপ্রচার করবেন ভাবলেন। তিনি প্রথম আলাড় কালাম ও রামপুত্র রুদ্রকের নিকট ধর্মপ্রচার করার কথা ভাবলেন। পরে তিনি জানতে পারলেন, তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। তখন তিনি প্রথম সাধনা জীবনের সঙ্গী পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট ধর্মপ্রচার করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সারনাথের ঋষিপতন মৃগদাবে গেলেন। সেদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। তিনি পঞ্চবর্গীয় শিষ্য-কৌন্ডিন্য, ভদ্দিয়, বপ্প, মহানাম ও অশ্বজিতের নিকট সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচার করেন, যা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র নামে পরিচিত।

চিত্র ৮: বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের ধর্ম দেশনা করছেন

চতুরার্য সত্য

চতুরার্য সত্য হলো মানুষের দুঃখ মুক্তির চারটি শ্রেষ্ঠ বা উত্তম সত্য। মহামানব গৌতম বুদ্ধ ছয় বছর কঠোর সাধনা করে চতুরার্য সত্য আবিষ্কার করেন। তিনি উপলব্ধি করলেন জগতে দুঃখ আছে এবং দুঃখের কারণও আছে। জন্মগ্রহণ করলে দুঃখ ভোগ করতে হবে। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বিয়োগ, ঈপ্সিতবস্তু অপ্রাপ্তি এবং পঞ্চস্কন্ধময় দেহ দুঃখ। তাই বুদ্ধ বলেছেন, জগতে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিরোধ আছে এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আছে। এ চারটি পরম সত্য হলো চতুরার্য সত্য। চতুরার্য সত্য বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিষয়। একে বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিও বলা হয়। চার আর্যসত্য কী কী? ১. দুঃখ আর্যসত্য, ২. দুঃখের কারণ আর্যসত্য, ৩. দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য এবং ৪. দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য। চার আর্যসত্যই জগতের প্রকৃত সত্য। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে দুঃখ হতে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের বললেন- 'হে ভিক্ষুগণ, প্রব্রজিতদের সাধনপথে দুটি বাধা পরিত্যাগ করা উচিত। ১. অতিমাত্রায় কষ্ট করা এবং ২. অতি ভোগ-বিলাসে ব্যস্ত থাকা।'

সংক্ষেপে চার আর্যসত্য হলো- দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায়।

ছক পূরণ: নিচের ছকটি যথাযথ শব্দ দিয়ে পূরণ করো:

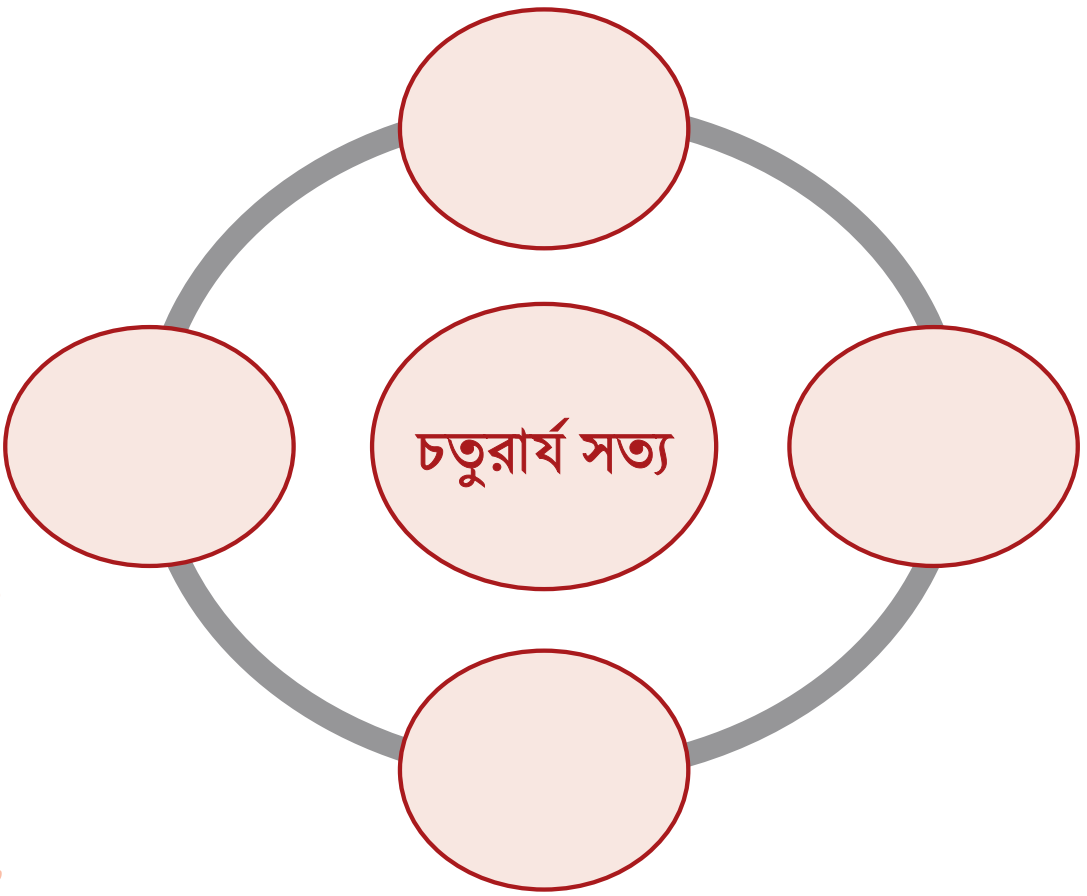

তালিকা তৈরি: দলে আলোচনা বা নিজে অনুসন্ধান করে- মানুষ কী কী কারণে দুঃখ পায়, তার একটি তালিকা তৈরি করো-

অভিজ্ঞতা: তোমার নিজের বা অন্য কারো একটি দুঃখের ঘটনা বর্ণনা করো-

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

ধারণা চিত্র: আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গসমূহ দিয়ে বৃত্তগুলো পূরণ করো-

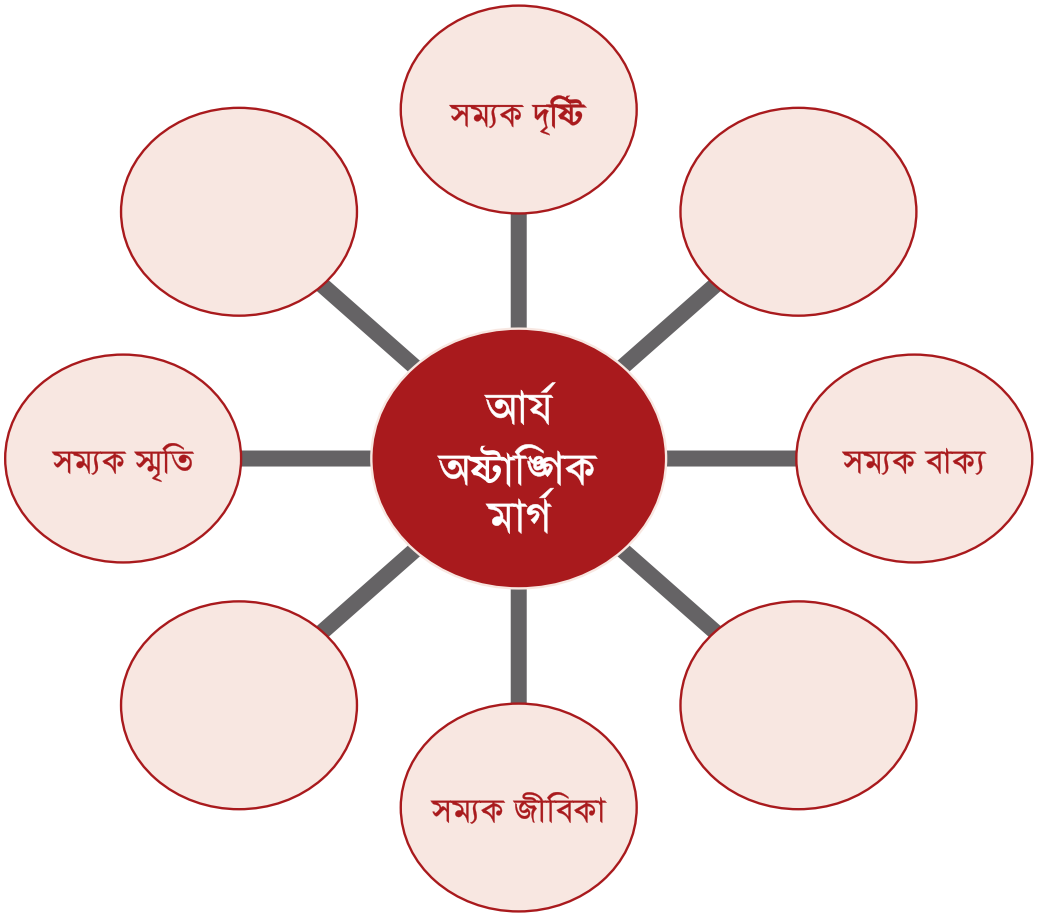

মার্গ শব্দের অর্থ পথ। বুদ্ধ দুঃখ হতে মুক্তি লাভের জন্য আটটি সম্যক পথ বা উপায় নির্দেশ করেছেন। বৌদ্ধ পরিভাষায় একে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়। আটটি মার্গ হলো : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

মানুষের জীবনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রকৃত শিক্ষা অনুশীলন একান্ত অপরিহার্য। সৎ, ন্যায়, পরোপকারী, মানবিক, নৈতিক গুণসম্পন্ন মানুষ হতে হলে এ আটটি সঠিক পথ অনুসরণে আদর্শ জীবন গঠন করা সকলের উচিত। এই আটটি উপায় দ্বারা জীবন থেকে দুঃখ দূর করে নির্বাণ লাভ সম্ভব। তাই এটি মধ্যমপথ নামেও পরিচিত।

সিদ্ধার্থ গৌতম সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য সুদীর্ঘ ৪৫ বছর ধর্মপ্রচার করেন। বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মবাণী চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধে বিভক্ত। বুদ্ধের প্রধান সেবক ছিলেন আনন্দ স্থবির, বুদ্ধের অপর শিষ্য উপালি স্থবির ছিলেন বিনয়ধর। ধর্মপ্রচার করার সময় বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক ছিলেন সারিপুত্র স্থবির এবং মৌদ্গাল্যায়ন স্থবির।

দলগত কাজ: আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গসমূহ একটি পোস্টার পেপারে এঁকে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করো-

বুদ্ধের অন্তিম জীবন

গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘ ৪৫ বছরব্যাপী সদ্ধর্ম প্রচার করেন। বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভের পূর্বে প্রিয় শিষ্য আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে কুশীনগর গমন করেন এবং বুদ্ধ বৈশালীতে বেলুব গ্রামে শেষ বর্ষাবাস যাপন করেন। এ সময়ে তিনি কঠিন অসুখে আক্রান্ত হন। তখন আনন্দ বুদ্ধের সেবা করেন। বুদ্ধ আনন্দকে বললেন, 'কঠোর অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে মুক্তির পথ নিজেকেই অর্জন করতে হয়। আনন্দ! নিজেই নিজের দীপ হয়ে বিচরণ করো, নিজেই নিজের শরণ গ্রহণ করো, অন্যের শরণ গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। ধর্মকে প্রদীপ হিসেবে ধারণ করো এবং সত্যকে সহায় করে নির্বাণের সন্ধানে প্রবৃত্ত হও।'

চিত্র ৯: বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ

এরপর বুদ্ধের নির্দেশে মাঘী পূর্ণিমায় ভিক্ষুসংঘ বৈশালীর চাপাল চৈত্যে সমবেত হলে বুদ্ধ ঘোষণা করলেন, 'আমার পরিনির্বাণ লাভের দিন ঘনিয়ে আসছে। আজ থেকে তিন মাস পর আমি পরিনির্বাণ লাভ করব।' এ কথা শুনে আনন্দ কান্নায় ভেঙে পড়লে বুদ্ধ বললেন, 'আনন্দ, আমি তো বারবার বলেছি- প্রিয়বস্তুর সাথে বিচ্ছেদ ঘটবেই। যার জন্ম আছে তার অবশ্যই মৃত্যু আছে। এটাই জগতের চিরন্তন নিয়ম।' তিনি ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে বললেন, 'ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে যে সত্য-ধর্ম শিক্ষা

দিয়েছি, তা সম্যকভাবে আয়ত্ত করো, তার সাধনা করো। সমস্ত জীবের প্রতি মৈত্রী পোষণ করে এ ধর্ম প্রচারে সচেষ্ট হও। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করে নির্বাণ লাভে সচেষ্ট হও।'

বৈশালী থেকে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে কুশীনগরে মল্লদের শালবনে উপস্থিত হলেন। আনন্দ বুদ্ধের নির্দেশে জোড়া শালবৃক্ষের মধ্যখানে উত্তর দিকে মাথা রেখে বুদ্ধের জন্য শয্যা তৈরি করলেন। সেদিন ছিল শুভ বৈশাখী পূর্ণিমার রাত। চারিদিক জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। বুদ্ধ সিংহশয্যায় শায়িত হয়ে আনন্দকে বললেন, আজ রাত্রির শেষ প্রহরে আমার পরিনির্বাণ লাভ হবে। তুমি কুশীনগরের মল্লদের এ সংবাদ প্রেরণ করো। এ কথা শুনে আনন্দ কান্নায় ভেঙে পড়লে বুদ্ধ আনন্দকে বললেন, আনন্দ! বৃথা কান্না করছ কেন? আমি তো তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছি, যাবতীয় প্রিয়বস্তু হতে একদিন বিচ্ছিন্ন হতে হবে। উৎপন্ন বস্তুমাত্রই ধ্বংসশীল। আনন্দ, তুমি দীর্ঘদিন তথাগতের সেবা করেছো। তোমার সাধনা ব্যর্থ হবে না। নির্বাণ সাধনায় উদ্যোগী হও, শীঘ্রই তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্তি লাভে সক্ষম হবে।

আনন্দ, তোমরা মনে করোনা, তোমাদের শিক্ষাগুরু আর নেই। আমার পরিনির্বাণের পর আমার দেশিত ধর্ম-বিনয়ই তোমাদের একমাত্র শাস্তা বা শিক্ষক।

বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে উপদেশ দিয়ে বললেন, 'হন্দদানি ভিক্খবে আমন্তযামি বো, বযধম্মা সঙ্খারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।' অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, তোমাদেরকে বলছি, সংস্কার ধর্মসমূহ একান্ত ক্ষয়শীল; তোমরা অপ্রমত্ত হয়ে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করো। এটাই মহাকারুণিক বুদ্ধের অন্তিম বাণী।

ভগবান বুদ্ধ এরকম উপদেশ প্রদান করে ধ্যানস্থ হন। প্রথম ধ্যান হতে দ্বিতীয় ধ্যানে, দ্বিতীয় ধ্যান হতে তৃতীয় ধ্যানে এবং সর্বশেষ চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি।

একক/দলগত কাজ: প্রিয় শিষ্য আনন্দের প্রতি বুদ্ধের উক্তি 'আনন্দ! প্রিয়বস্তু হতে একদিন বিচ্ছিন্ন হতে হবে। উৎপন্ন বস্তুমাত্রই ধ্বংসশীল' দলে আলোচনা করে এর অর্থ লেখো-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ত্রিপিটক পরিচয়: বিনয় ও অভিধর্ম পিটক

এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যা আছে–

- বিনয় পিটক
- অভিধর্ম পিটক
- বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক গ্রন্থের বর্ণনা

চিত্র ১০: পাঠাগারে শিক্ষার্থীরা বই পড়ছে

ত্রিপিটক পরিচিতি

বোধিমিত্র বড়ুয়া গল্প, উপন্যাস ও ধর্মীয় বই পড়তে পছন্দ করে। সে প্রায় সময় বিদ্যালয় ও বিহারের পাঠাগারে যায়। একদিন সে পাঠাগারে ধর্মীয় একটি বই পড়ে ত্রিপিটক সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারে। তোমরা কি বোধিমিত্রের মতো কোনো পাঠাগার দেখেছ? পাঠাগারে বিভিন্ন রকমের বই থাকে। সেই পাঠাগার থেকে পছন্দের বই নিয়ে তোমরা পড়তে পারো। ধর্মীয় বই সংগ্রহ করে কিংবা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করেও পড়তে পারো। ধর্মীয় বই পড়লে তোমরা ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে।

তোমাদের জানা কয়েকটি ধর্মীয় গ্রন্থের নাম লেখো:

চিত্র ১১: ত্রিপিটক

ত্রিপিটকের বিভিন্ন অংশ

গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর মানব কল্যাণে ধর্মবাণী প্রচার করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মবাণী, ধর্মীয় বিধি-বিধান, শিক্ষা ও উপদেশসমূহ যে গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তার নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ত্রি+পিটক = ত্রিপিটক। তিনটি পিটকের সমন্বয় হলো ত্রিপিটক। পিটক শব্দের অর্থ ঝুড়ি। ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত। ত্রিপিটকের মূল বিষয়বস্তু তিনটি ভাগে বিভক্ত। এ তিনটি ভাগ হলো–

ক. সূত্র পিটক

খ. বিনয় পিটক এবং

গ. অভিধর্ম পিটক।

তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে ত্রিপিটক অংশে সূত্র পিটক সম্পর্কে জেনেছো। এ পরিচ্ছেদে আমরা বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক সম্পর্কে আলোচনা করব।

বিনয় পিটক

ধারণা চিত্র: সঠিক শব্দ দিয়ে ত্রিপিটকের বিভিন্ন অংশের নাম খালি ঘরে পূরণ করো

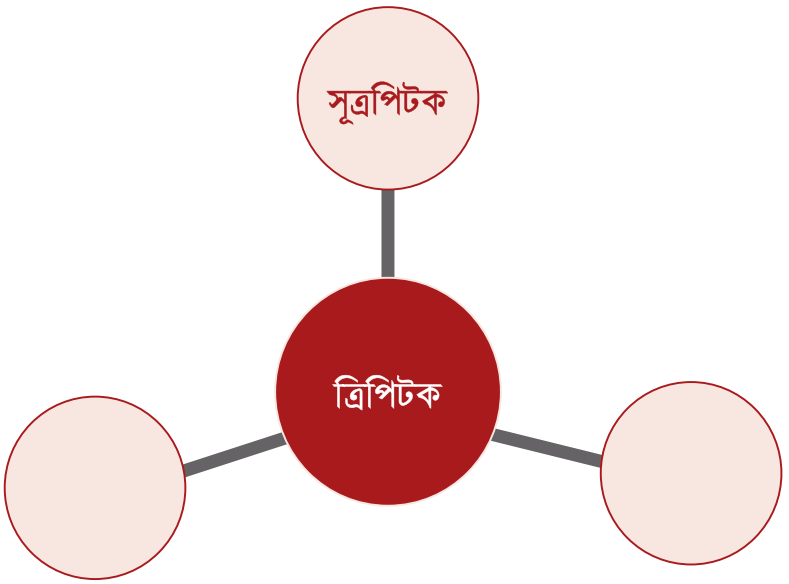

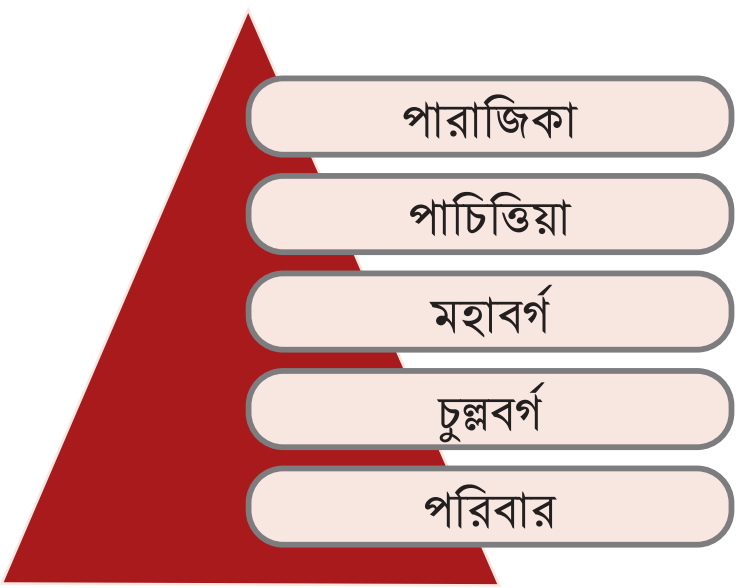

বিনয় পিটক ত্রিপিটকের অন্যতম বিভাগ। 'বিনয়' শব্দের অর্থ নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা, আচার-অনুশাসন ইত্যাদি। গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আদর্শ জীবন গঠনের জন্য বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রচলন করেন। সংঘের নিয়মানুবর্তিতা, নৈতিকতা, নিয়ম-কানুন, আচার-অনুশাসনসমূহ যে পিটকে বর্ণিত আছে, তাকে বিনয় পিটক বলে। পৃথিবীর সব কিছুই নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ।

বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের শৃঙ্খলিত জীবনযাপনের জন্য বুদ্ধ বিনয়ের অনুশাসন প্রবর্তন করেন। শ্রমণ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ বিনয় পিটকের নিয়ম-নীতি ও শিক্ষাপদ অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করেন। এ কারণে বিনয়কে বুদ্ধশাসনের আয়ু বলা হয়। বিনয় অনুশাসন ব্যতীত বুদ্ধশাসন চলতে পারে না।

বিনয় পিটকে পাঁচটি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থগুলো হলো–

১. পারাজিকা
২. পাচিত্তিয়া
৩. মহাবর্গ
৪. চুল্লবর্গ এবং
৫. পরিবার।

পারাজিকা ও পাচিত্তিয়াকে একত্রে সুত্তবিভঙ্গ এবং মহাবর্গ ও চুল্লবর্গকে একত্রে খন্ধক বলা হয়। সংক্ষেপে বিনয় পিটকের তিনটি ভাগ হলো: ক. সুত্তবিভঙ্গ, খ. খন্ধক এবং গ. পরিবার।

একক কাজ: বিনয় শব্দের অর্থ ও বিনয় পিটকের গ্রন্থসমূহের নাম লেখো-

বিনয় শব্দের অর্থ

বিনয় পিটকের গ্রন্থের নাম

চিত্র ১২: ত্রিপিটকের গ্রন্থ

ক. সুত্ত বিভঙ্গ

সুত্ত+বিভঙ্গ=সুত্ত বিভঙ্গ। ধর্মীয় বিধি-বিধান ও নীতিমালার ধারাবাহিক বিশ্লেষণ এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে সুত্ত বিভঙ্গে। সুত্ত বিভঙ্গের দুটি বিষয়– পারাজিকা ও পাচিত্তিয়া। একে ভিক্ষু বিভঙ্গ ও ভিক্ষুণী বিভঙ্গও বলা হয়।

১. পারাজিকা

এই অংশে পারাজিকা ও সংঘাদিসেস দুটি বিষয়ের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। 'পারাজিকা' অর্থ পরাজয় বা পতন, অর্থাৎ ভিক্ষু ধর্মের নীতি থেকে পরাজয়। পারাজিকা হলো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এ অপরাধ বা পারাজিকা প্রাপ্ত হলে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী স্বধর্মে আর থাকতে পারেন না। ভিক্ষুধর্ম ত্যাগ করতে হয়। পালিতে পারাজিকা ৪ প্রকার। আর সংঘাদিসেস হলো তেরো প্রকার।

২. পাচিত্তিয়া

এখানে পাচিত্তিয়াসহ ছয়টি বিধি বর্ণিত আছে। যেমন– অনিয়ত, নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়া, পটিদেসনীয়, সেখিয়া ও অধিকরণ সমথ। 'পাচিত্তিয়া' অর্থ প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ দোষ স্বীকার বা দুঃখ প্রকাশ ইত্যাদি। কৃত দোষ-ত্রুটি থেকে পরিত্রাণপূর্বক বুদ্ধশাসনে কুশলধর্ম অনুশীলন বা পরিশুদ্ধিতা লাভের জন্য পাচিত্তিয়া কর্ম করতে হয়। পাচিত্তিয়া গ্রন্থটি নয়টি বর্গে বিভক্ত। এ গ্রন্থে ৯২টি নিয়ম বর্ণিত আছে।

একক/জোড়ায় কাজ: জোড়ায় আলোচনা করে পারাজিকা ও পাচিত্তিয়া গ্রন্থের শিক্ষা একজন ভিক্ষুর জীবনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা বর্ণনা করো-

খন্ধক

বিনয় পিটকের দ্বিতীয় ভাগ হলো খন্ধক। খন্ধকের মহাবর্গ ও চুল্লবর্গ নামে দুটি খণ্ড আছে।

৩. মহাবর্গ

মহাবর্গ একটি বিরাট গ্রন্থ। বুদ্ধের সময়ের বহু মূল্যবান ঘটনা ও ধর্মপ্রচার এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থ পাঠ করে বুদ্ধের জীবনের ঘটনা, বুদ্ধত্ব লাভ, ধর্মপ্রচার, উপোসথ, প্রবারণা, কঠিন চীবর, ভৈষজ্য, চর্ম এবং সংঘের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, সংঘের বিভিন্ন নিয়ম-নীতি সম্পর্কে জানা যায়। মহাবর্গে সর্বমোট ১০টি অধ্যায় আছে। প্রতিটি বিষয়ের ভিত্তিতে অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে।

৪. চুল্লবর্গ

'চুল্ল' শব্দের অর্থ ছোটো বা ক্ষুদ্র। এ গ্রন্থের অধ্যায় বা বিষয়সমূহ মহাবর্গের চেয়ে ছোটো। সে কারণে একে চুল্লবর্গ বলা হয়। চুল্লবর্গকে মহাবর্গের বর্ধিত কলেবর বলা হয়। এ গ্রন্থেও বুদ্ধের জীবন কাহিনি, ধর্মপ্রচার ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে। চুল্লবর্গে মোট ১২টি অধ্যায় আছে। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু হলো কর্ম, পারিবাসিক, সমুচ্চয়, সমথ, সংঘভেদ, ব্রত, পাতিমোক্ষ, ভিক্ষুণী, সংগীতি ইত্যাদি।

৫. পরিবার

পরিবার বিনয় পিটকের শেষ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচরণ বিধি সম্পর্কীয় বিনয়ের বহু জটিল বিষয় অতি সহজ, সংক্ষিপ্ত ও সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিনয়ের অন্যান্য গ্রন্থের মতো পরিবারও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। নতুন শ্রমণ ও ভিক্ষুদের বিনয় শিক্ষার জন্য এটি অত্যন্ত মূল্যবান। এ গ্রন্থে গদ্য ও পদ্যে রচিত ছোটো-বড়ো একুশটি অধ্যায় রয়েছে। এতে মূলত বিনয়ের শিক্ষাপদসমূহ সংক্ষিপ্ত রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ কারণে এটিকে বিনয় পিটকের সারবস্তু বলা হয়।

একক/জোড়ায় কাজ: জোড়ায় আলোচনা করে বিনয় পিটকের বিভিন্ন বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতিসমূহ ভিক্ষুসংঘ ছাড়াও সাধারণ মানুষের জীবনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো-

অভিধর্ম পিটক

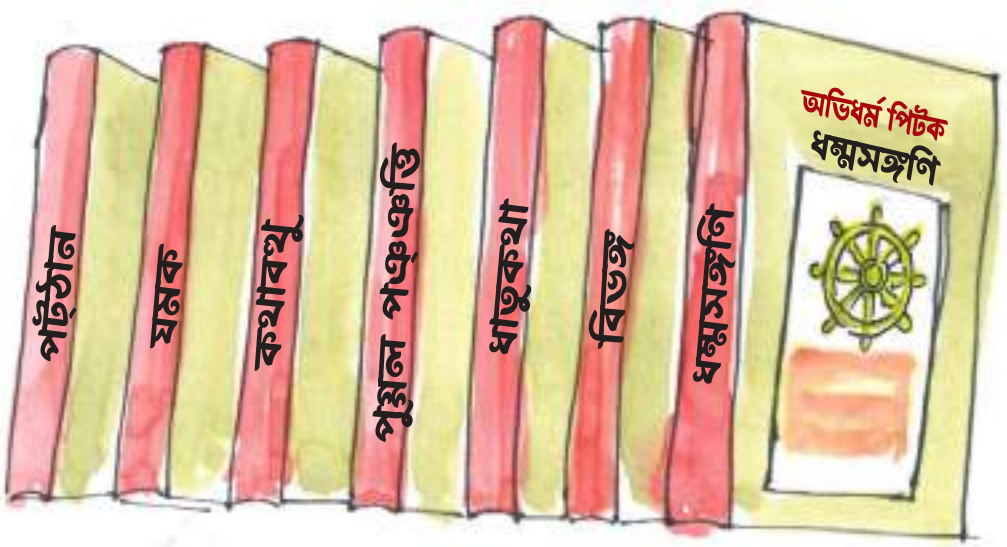

চিত্র ১৩: অভিধর্ম পিটকের ৭টি গ্রন্থ

অভিধর্ম ত্রিপিটকের তৃতীয় ভাগ। এটি ত্রিপিটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পালি সাহিত্যমতে, ধর্ম ও অভিধর্মের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। শুধু ধর্মের দর্শনতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলোকে অধিক গুরুত্ব দানের জন্য 'অভি' উপসর্গটি যুক্ত করা হয়েছে। অভিধর্ম শব্দের অর্থ বিশিষ্ট ধর্ম, অতিরিক্ত ধর্ম, অধিকতর ধর্ম। অভিধর্ম পিটকে মোট সাতটি গ্রন্থ আছে। এ সাতটি গ্রন্থের সমষ্টিকে সপ্তপ্রকরণ বলা হয়। যথা: ১. ধম্মসঙ্গাণি, ২. বিভঙ্গ ৩. ধাতুকথা ৪. পুগ্গল পঞ্ঞত্তি ৫. কথাবত্থু ৬. যমক ৭. পট্ঠান। অভিধর্ম পিটকের মূল বিষয়বস্তু– চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ।

অভিধর্ম পিটক হলো বুদ্ধের শিক্ষা ও দর্শনের ব্যাখ্যা। অভিধর্মকে ত্রিপিটকের হৃৎপিণ্ড বলা হয়। বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভ করার পর সপ্ত মহাস্থানে বুদ্ধ অর্জিত জ্ঞান ও ধর্মের তাৎপর্য চিন্তা করেন। সপ্তম সপ্তাহে সপ্তপ্রকরণ অভিধর্ম দেশনা সম্পন্ন করেন। এরপর বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে গমন করেন। সেখানে তিনি তিন মাসব্যাপী মাতৃদেবী ও অন্যান্য দেবতাকে প্রথম অভিধর্ম দেশনা করেন। পরবর্তী সময়ে তাবতিংস দেবলোক থেকে পৃথিবীতে এসে মানবকল্যাণে অভিধর্ম দেশনা করেন। এভাবেই অভিধর্মের উৎপত্তি হয়।

প্রদর্শন: অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থের নাম ও পরিচয় পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করো-

ধারণা চিত্র: নিচের প্রবাহ চিত্রে অভিধর্ম পিটকের মূল বিষয়বস্তু লেখো-

অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থ-বর্ণনা

১. ধম্মসঙ্গাণি : অভিধর্ম পিটকের প্রথম গ্রন্থ হলো ধম্মসঙ্গাণি বা ধর্মসঙ্গাণি। এর অর্থ ধর্মের প্রকৃতি বা স্বরূপ, শ্রেণিবিভাগ, ধর্মের সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা ও ব্যাখ্যা। এটি অভিধর্ম পিটকের সারাংশ। ধর্মসঙ্গাণির বিষয়বস্তু দর্শনতাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণমূলক। এতে চিত্ত ও চৈতসিকের পরিচয়, জড় পদার্থের বর্ণনা আছে। বিশেষ করে কুশল ও অকুশল চিত্তের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাই ধর্মসঙ্গাণিকে অভিধর্ম পিটকের মূলস্তম্ভ বলা হয়।

২. বিভঙ্গ : বিভঙ্গ শব্দের অর্থ বিশদ ব্যাখ্যা। এ গ্রন্থের বিষয়ও দর্শনতাত্ত্বিক। এতে স্কন্ধ, ধাতু, ইন্দ্রিয়, আয়তন, প্রত্যয় তথা মানুষের শরীর ও মনের বিশদ ব্যাখ্যা আছে। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু অতি চমৎকার।

৩. ধাতুকথা : ধাতুকথা শব্দের অর্থ 'ধাতু' সম্পর্কীয় কথা। বৌদ্ধধর্ম দর্শনের বেশ কিছু মৌলিক বিষয়ের তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা গ্রন্থটিতে বর্ণিত হয়েছে। তাই এটি বৌদ্ধধর্মের অন্যতম দর্শনশাস্ত্র। এতে ধ্যানপরায়ণ ভিক্ষুর নৈতিক ও মানসিক অবস্থা-সম্পর্কিত আলোচনা আছে।

৪. পুগ্গল পঞ্ঞত্তি : 'পুগ্গল' শব্দের অর্থ ব্যক্তি বা পুরুষ, সত্তা, যা দ্বারা মানুষকে বোঝায়। 'পঞ্ঞত্তি' অর্থ প্রজ্ঞপ্তি, প্রকাশ বা পরিচয়। বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তি বা পুরুষের যথার্থ পরিচয়, শ্রেণিবিন্যাস, স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য বর্ণনা এ গ্রন্থের বিশেষত্ব। এ গ্রন্থে দশটি অধ্যায় রয়েছে।

জোড়ায় কাজ: উল্লিখিত বিষয়ের আলোকে এক বাক্যে নিচের ছকে তিনটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু লেখো-

ধম্মসঙ্গাণি

বিভঙ্গ

পুগ্গল পঞ্ঞত্তি

৫. কথাবত্থু: অভিধর্মের পঞ্চম গ্রন্থ কথাবত্থু। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কথাবত্থু একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ। একে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত তর্কশাস্ত্র বলা হয়। ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলোর মধ্যে একমাত্র কথাবত্থু গ্রন্থের রচয়িতা বা সংকলকের নাম পাওয়া যায়। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় সংগীতি শেষে মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থবির কথাবত্থু রচনা করেন। এ গ্রন্থে তেইশটি অধ্যায় রয়েছে। মূলত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে মিথ্যাদৃষ্টি দূর করে সত্য বর্ণনা করাই এ গ্রন্থ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থবির এই গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন বিভাজ্যবাদ বা থেরবাদ বুদ্ধের মূল নীতি।

৬. যমক: 'যমক' শব্দটি যুগল বা জোড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'যমক' বলতে এখানে একই বিষয়ে দুটি প্রশ্নের ব্যাখ্যা করাকে বোঝায়। এ গ্রন্থটিতে স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রশ্নের সহজ সমাধান রয়েছে। এতে দর্শন, ইন্দ্রিয়, কুশল, অকুশল এবং তার মূল সম্পর্কে আলোচনা আছে। গ্রন্থটি তিন খন্ডে রচিত এবং দশ প্রকার যমকে বিভক্ত।

৭. পট্ঠান: ‘পট্ঠান’ শব্দের অর্থ মূল কারণ বা প্রকৃত কারণ বা হেতু ইত্যাদি। এর বিষয়বস্তু প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি বা কার্যকারণ তত্ত্ব সম্পর্কিত। বিশেষত নামরূপ বা শরীর ও মনের অনিত্যতা এবং অনাত্মা সম্পর্কে আলোচনাই এ গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ গ্রন্থে ২৪ প্রকার প্রত্যয় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যয় হলো যার মাধ্যমে কোনো কার্য সংঘটিত হয়। নির্বাণ ব্যতীত সমস্ত জাগতিক বস্তুর কার্যকারণ নির্ণয় করাই পট্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

অনুচ্ছেদ লেখা: ‘কথাবত্থু’ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখো-

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিই :

১। কপিলাবস্তু রাজ্যে কারা রাজত্ব করতেন?
ক) শাক্য বংশীয় ক্ষত্রিয়রা খ) কোলিয়রা গ) বৈশ্যরা ঘ) ব্রাহ্মণরা

২। আদর্শ জীবন গঠন করে জীবন থেকে দুঃখ দূর করার উপায় কী?
ক) চতুরার্য সত্য জানা
খ) আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা
গ) শৃঙ্খলা বজায় রাখা
ঘ) অনুশাসন মেনে চলা

৩। নীরবে বসে সিদ্ধার্থ কী ভাবতেন?
ক) সিংহাসন লাভের উপায়
খ) জীবের দুঃখ মুক্তির উপায়
গ) রাজ্য জয়ের উপায়
ঘ) প্রজাদের দুঃখ দূর করার উপায়

৪। বুদ্ধ কখন বুঝলেন তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ?
ক) বিবাহের পর
খ) গৃহত্যাগের পর
গ) বোধিজ্ঞান লাভের পর
ঘ)মহাপরিনির্বাণ লাভের পর

৫। পারাজিকা হলো-
ক) ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ খ) প্রায়শ্চিত্য গ) ক্ষমা প্রার্থনা ঘ) শ্রদ্ধা নিবেদন।

খ) শূন্যস্থান পূরণ করি :

১। কুমার সিদ্ধার্থের শিক্ষাগুরু ছিলেন _____।

২। সিদ্ধার্থ গৌতম আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিনে _____ করবেন বলে সংকল্প গ্রহণ করেন।

৩। তিনি _____ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

৪। বিনয়কে বুদ্ধশাসনের _____ বলা হয়।

৫। উৎপন্ন বস্তু মাত্রই _____।

গ. মিল করি:

বাম পাশ	ডান পাশ
১। চতুরার্য সত্য হলো	ক) একান্ত ক্ষয়শীল।
২। সংস্কার ধর্মসমূহ	খ) জীবন থেকে দুঃখ দূর করা সম্ভব।
৩। আটটি উপায় দ্বারা	গ) মানব জীবনের চারটি শ্রেষ্ঠ বা উত্তম সত্য।
৪। বিনয় অনুশাসন ব্যতীত	ঘ) পাচিত্তিয়া কর্ম করতে হয়।
৫। পরিশুদ্ধি লাভের জন্য	ঙ) বুদ্ধশাসন চলতে পারে না।

ঘ. শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নির্ণয় করি:

১। কুমার সিদ্ধার্থ হাঁসটিকে সুস্থ করে আকাশে উড়িয়ে দিলেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। বিভঙ্গকে অভিধর্ম পিটকের মূলস্তম্ভ বলা হয়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। 'পট্ঠান' এর বিষয়বস্তু হলো প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। চতুরার্য সত্যকে বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি বলা হয়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। পারাজিকা ও পাচিত্তিয়াকে একত্রে যমক বলে। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। চতুরার্য সত্যগুলো কী কী?

২। বিনয়কে কেনো বুদ্ধ শাসনের আয়ু বলা হয়?

৩। মানুষ কী কী কারণে দুঃখ পায়?

৪। বুদ্ধের অন্তিম বাণী বা শেষ বাক্য কী ছিল?

৫। তোমার সামনে কোন প্রাণী আহত হলে তুমি কী করবে?

চ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১। পাঠ্য বইয়ের চারি নিমিত্ত দর্শন পাঠ করে তুমি কী উপলব্ধি করেছো ব্যাখ্যা করো ।

২। সিদ্ধার্থের জীবে দয়া সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণনা করো।

৩। দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায় ব্যাখ্যা করো।

৪। বিনয় পিটকের যেকোনো দুইটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু আলোচনা করো।

৫। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তা লেখো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

এ অধ্যায়ে যা আছে –

- উপালি থের'র পরিচিতি
- বুদ্ধবাণী সংকলনে উপালি থের'র ভূমিকা
- মহাপ্রজাপতি গৌতমীর পরিচিতি
- ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠায় মহাপ্রজাপতি গৌতমী থেরীর অবদান
- অনাথপিণ্ডিকের পরিচিতি
- বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে অনাথপিণ্ডিকের অবদান

আদর্শ জীবন পরিচিতি

ছক পূরণ: তোমার দেখা সবচেয়ে ভালো ব্যক্তিটি কে? যাঁকে তুমি খুব পছন্দ করো। যাঁর গুণাবলি তুমি অনুসরণ করো। যাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তোমাকে অনুপ্রাণীত করে। তোমার দেখা প্রিয় ব্যক্তি সম্পর্কে নিচের ছকটি পূরণ করো-

প্রিয় ব্যক্তির নাম	
কেন তাঁকে পছন্দ করো?	
তাঁর কয়েকটি গুণ	

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনেক আদর্শবান ও মহান ব্যক্তি স্মরণীয় হয়ে আছেন। যাঁরা কর্মগুণে নিজেদেরকে বরণীয় এবং পূজনীয় করেছেন। ধর্মের প্রচার-প্রসারেও তাঁরা অনেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সর্বদা মানবকল্যাণে তাঁরা নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন। মানুষকে ধর্ম উপদেশ দিয়ে সৎ পথে পরিচালিত করতেন। তাঁরা বিনয়ী, ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম, সংঘ ও সমাজের কল্যাণে নিবেদিত সেসব ব্যক্তির মধ্যে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা এবং শ্রেষ্ঠী ছিল অন্যতম।

গৌতম বুদ্ধ সদ্ধর্মের বাণী সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সংঘ। সে সংঘ পরিচালনা করা হতো ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদেরকে নিয়ে। তাঁরা বুদ্ধের শ্রাবক-শ্রাবিকা, শিষ্য-প্রশিষ্য হিসেবে পরিচিত ছিল। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের থের-থেরীও বলা হয়। তাঁরা ধর্মত ও বিনয় সম্মত জীবনযাপন করতেন। বুদ্ধবাণী স্মৃতিতে ধারণ করার মাধ্যমে তাঁরা তা সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মানুষকে তাঁরা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতার শিক্ষা দিতেন। ভিক্ষু বা থেরগণের মধ্যে আনন্দ, উপালি, সারিপুত্র, মৌদ্গাল্যায়ন ছিলেন অন্যতম। অন্যদিকে ভিক্ষুণী বা থেরীগণের মধ্যে মহাপ্রজাপতি গৌতমী, উৎপলবর্ণা, ক্ষেমা, ইসিদাসী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বুদ্ধের শ্রাবক শিষ্যের পাশাপাশি গৃহী শিষ্যও ছিল। বুদ্ধের শিষ্য হলেও তাঁরা পরিবার পরিজন নিয়ে গৃহে বসবাস করতেন। ধর্মের প্রচার-প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা, দানাদিসহ বিভিন্ন কুশল কর্ম সম্পাদন করে তাঁরা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। গৃহী শিষ্যদের মধ্যে রাজা-মহারাজা, শ্রেষ্ঠী যেমন ছিল তেমনি সাধারণ উপাসক-উপাসিকাও ছিল। বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতিতে যেসব গৃহী শিষ্য অবদান রাখেন তাদের মধ্যে অনাথপিন্ডিক শ্রেষ্ঠী, মিগার শ্রেষ্ঠী, ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এ অধ্যায়ে আমরা উপালি থের, মহাপ্রজাপতি গৌতমী এবং অনাথপিন্ডিক শ্রেষ্ঠী সম্পর্কে জানবো।

বৈশিষ্ট্য পার্থক্যকরণ: জোড়ায় অথবা নিজে অনুসন্ধান করে বুদ্ধের শ্রাবক শিষ্য এবং গৃহী শিষ্যদের বৈশিষ্ট্য পার্থক্যকরণ করো-

বুদ্ধের শ্রাবক শিষ্য	বুদ্ধের গৃহী শিষ্য/শ্রেষ্ঠী

ছক পূরণ: জোড়ায় অথবা নিজে অনুসন্ধান করে নিচের নামগুলো সঠিক স্থানে লেখো-

ক্ষেমা, আনন্দ, মহাপ্রজাপতি গৌতমী, উপালি, মিগার শ্রেষ্ঠী, সারিপুত্র, মৌদ্গাল্যায়ন, ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী, উৎপলবর্ণা, অনাথপিন্ডিক শ্রেষ্ঠী, ইসিদাসী

ভিক্ষু	ভিক্ষুণী	বুদ্ধের গৃহী শিষ্য/শ্রেষ্ঠী

উপালি থের

উপালি ছিলেন বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। কপিলাবস্তুর এক নাপিত বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ছিল কপিলাবস্তুর রাজবংশের নাপিত। তাঁর মাতার নাম ছিল মন্তানী। পিতা-মাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন পূর্ণ। পিতা রাজবংশের নাপিত হওয়ার সুবাদে পূর্ণ বেড়ে উঠেছিলেন রাজকুমারদের সাথে। তিনি ছিলেন রাজকুমারদের খেলার সাথী। তাঁর সাথীদের মধ্যে আনন্দ, ভদ্রিয়, অনুরুদ্ধ, ভৃগু, দেবদত্ত ও কিম্বিল উল্লেখযোগ্য।

একদিন রাজকুমাররা জানতে পারলেন বুদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে কথা শুনে শাক্য রাজকুমাররা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁরা বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। সে উদ্দেশ্যে তাঁরা যাত্রা করলেন। রাজকুমারদের মনোভাব জেনে পূর্ণও তাঁদের সঙ্গী হলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর রাজকুমাররা তাঁদের পোশাক পরিচ্ছদ ও অলংকারসমূহ খুলে পূর্ণের হাতে তুলে দিলেন। তাঁরা পূর্ণকে কপিলাবস্তুতে ফিরে যেতে বললেন। রাজকুমাররা চলে যাওয়ার পর পূর্ণ চিন্তা করতে লাগলেন। রাজকুমাররা ধন সম্পদের মধ্যে লালিত পালিত হয়েও সব কিছু পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা নিচ্ছেন। তাহলে আমি কেন পারব না? আমার তো কিছুই নেই। রাজপুত্র হয়ে তাঁরা যদি সংসার ত্যাগ করতে পারে, তাহলে আমিও পারব। এ উপলব্ধির পর তিনি রাজকুমারদের দেওয়া জিনিসগুলো পথের একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখলেন। এরপর তিনিও রাজকুমারদের পথ অনুসরণ করে বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নিতে গেলেন।

সে সময় বুদ্ধ মল্লরাজ্যের এক বাগানে অবস্থান করছিলেন। বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে রাজকুমাররা প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন। পূর্ণও সে সময় উপস্থিত হয়ে বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করেন। রাজপুত্রদের মধ্যে বুদ্ধ সর্বপ্রথম পূর্ণকে দীক্ষা প্রদান করেন। দীক্ষা নেওয়ার পর পূর্ণের নাম রাখা হয় উপালি। উপালি অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং মেধাবী ছিলেন। দীক্ষার পর উপালি ধ্যান সমাধি করার জন্য একাকী অরণ্যে বাস করতে চেয়েছিলেন। উপালির জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে বুদ্ধ অবগত ছিলেন। তাই তাঁকে অরণ্যে বসবাস না করে বুদ্ধের সাথে অবস্থান করতে বললেন। বুদ্ধের সাথে থেকে বিনয় অনুশীলন করতে বললেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বুদ্ধের একনিষ্ঠ শিষ্য হয়ে ওঠেন। তিনি সর্বদা বুদ্ধের সাথে থাকতেন। বুদ্ধের কাছে বিনয়নীতি শিক্ষা করতেন। বুদ্ধ দেশিত সকল বিনয় তিনি স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন এবং বিনয়-বিধান সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। বিনয়ে পারদর্শিতা দেখে বুদ্ধ এক ধর্মসভায় উপালিকে 'বিনয়ধর' ঘোষণা করেন। বিনয়ধর মানে নীতিজ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধবাণী সংকলনে উপালি থের'র ভূমিকা

বুদ্ধবাণী সংকলনের জন্য প্রথম সংগীতি আয়োজন করা হয় বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন মাস পর। সংগীতি বলতে ধর্মসভা, সম্মেলন, সমাবেশ, সঙ্ঘায়ন, অধিবেশন ইত্যাদি বোঝায়। সংগীতিতে ধর্ম ও বিনয় সংগৃহীত হয়। এ সংগীতিতে উপালি থেরকে ধর্মাসনে বসিয়ে বিনয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। বুদ্ধভাষিত বিনয়সমূহ তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত ভিক্ষুগণ উপালি কর্তৃক দেশিত বিনয়ের যথার্থতা পরীক্ষা করেন। পরবর্তীতে ভিক্ষুগণ তা অনুমোদন করেন। এ

সংগীতিতে তাঁর আবৃত্তির মাধ্যমে বিনয় সংগৃহীত হয়। বুদ্ধবাণী সংরক্ষণের ইতিহাসের সাথে উপালি থের'র নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাঁর জীবনী পাঠে আমরা বুঝতে পারি কর্মের মাধ্যমেই মানুষ তাঁর সাফল্যের শিখরে উন্নীত হতে পারে।

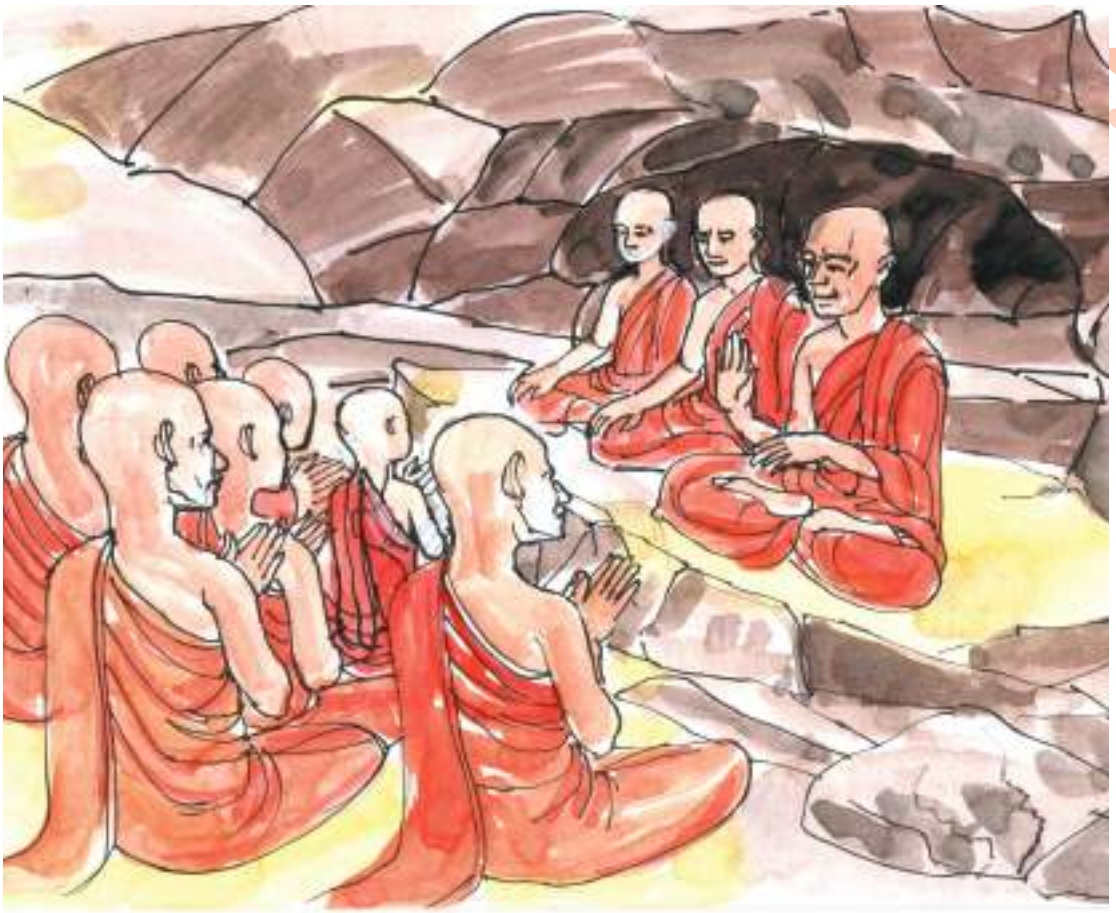

চিত্র ১৪: প্রথম সংগীতিতে বিনয় দেশনারত উপালি থের

একক কাজ: তোমার দুইজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও তারা কে কী কাজ ভালোভাবে করতে পারে? এই দক্ষতা তারা কোন ভালো কাজে ব্যবহার করতে পারে? লিখে উপস্থাপন করো-

মহাপ্রজাপতি গৌতমী

মহাপ্রজাপতি গৌতমী বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত থেরী। তিনি কপিলাবস্তুর নিকটবর্তী দেবদহ নগরের রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের পত্নী মহামায়ার ছোটো বোন। সে হিসেবে তিনি ছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতমের মাসি। সিদ্ধার্থের জন্মের সাত দিন পর মহামায়া মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী সময়ে শুদ্ধোদন মহাপ্রজাপতিকে বিবাহ করেন। মহামায়ার মৃত্যুর পর সিদ্ধার্থ গৌতমের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন মহাপ্রজাপতি। তিনি সিদ্ধার্থকে নিজ পুত্রের চেয়েও অধিক ভালোবাসতেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নন্দ নামে এক পুত্র সন্তান ছিল। তিনি নন্দের লালন পালনের ভার অর্পণ করেছিলেন ধাত্রীর উপর। কিন্তু সিদ্ধার্থের যত্ন তিনি নিজেই করতেন।

পরবর্তী সময়ে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে কঠোর ধ্যান সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। একসময় বুদ্ধ কপিলাবস্তু আসলে নন্দকেও প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। রাজা শুদ্ধোদন পরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী দুঃখমুক্তির জন্য সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।

ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠায় মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অবদান

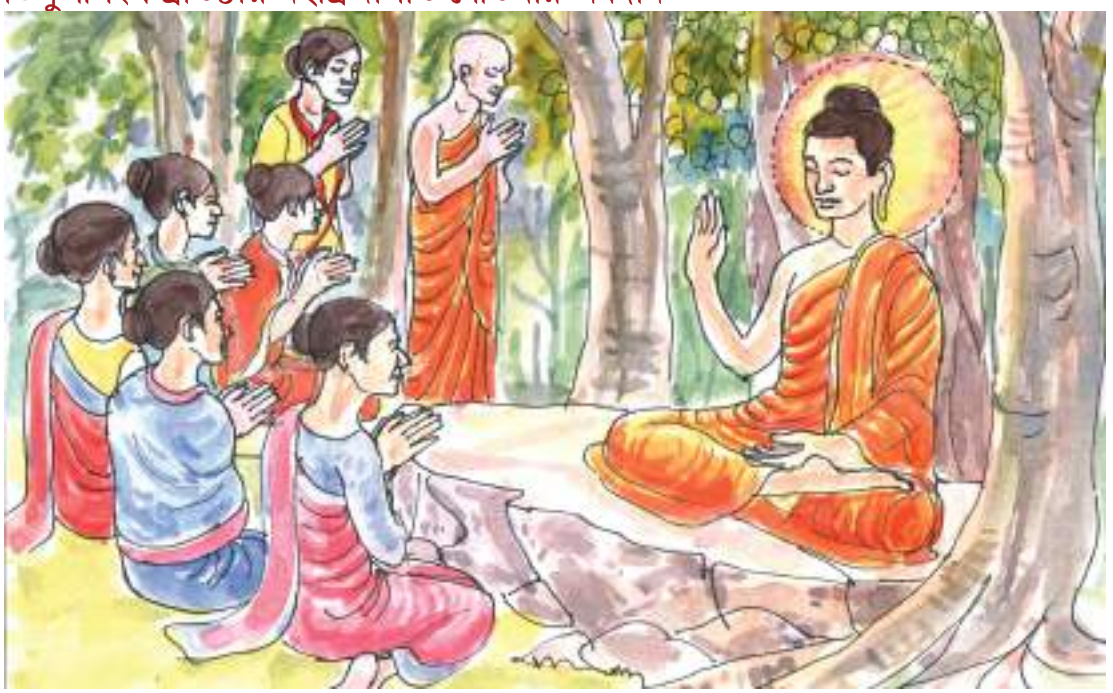

চিত্র ১৫: বুদ্ধের সম্মুখে মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও শাক্যবংশীয় নারীগণ

একদিন বুদ্ধ শাক্য এবং কোলিয়দের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার জন্য কপিলাবস্তুতে আসেন। সে কথা জানতে পেরে মহাপ্রজাপতি গৌতমী বুদ্ধের সাথে দেখা করে সংসার ত্যাগের ইচ্ছা পোষণ করেন। বুদ্ধের কাছে ভিক্ষুণী জীবন গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাঁর প্রস্তাবে রাজি না হয়ে বৈশালীতে ফিরে যান। কিন্তু মহাপ্রজাপতি গৌতমী এতে হতাশ হলেন না। কেননা, তাঁর মতো সংসার ত্যাগে ইচ্ছুক এ রকম আরও অনেক শাক্য নারী ছিল। দ্বিতীয়বার তিনি পাঁচশত শাক্য নারীসহ বৈশালী গিয়ে বুদ্ধের

কাছে উপস্থিত হন। এবারও বুদ্ধ রাজি হননি। কারণ তিনি চিন্তা করলেন, সংঘে নারী পুরুষের একসাথে প্রবেশাধিকার থাকলে সংঘ কলুষিত হতে পারে। সংসার ত্যাগের উদ্দেশ্য পূরণ না-ও হতে পারে। এ কারণে বুদ্ধ ভিক্ষুণীসংঘ গঠনে প্রথমে রাজি হননি। পরবর্তী সময়ে বুদ্ধের শিষ্য এবং সেবক আনন্দের অনুরোধে বুদ্ধ তাঁদের প্রার্থনা অনুমোদন করেন। নারীগণ সংঘভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলেন। এভাবে নারীদের নিয়ে ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দীক্ষার পর সকলে সমবেত হয়ে বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করেন। বুদ্ধ সকলের উদ্দেশে ধর্ম দেশনা করেন। বুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে সকলেই অর্হত্ব ফল (জ্ঞানের উচ্চতর স্তর) লাভ করেন। বুদ্ধ এক ধর্মসভায় ভিক্ষুণীদের মধ্যে মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন ভিক্ষুণী সংঘের প্রধান। তিনি সব সময় পিছিয়ে পড়া নারীদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করতেন। নারী জাতির উন্নয়নে তিনি সারাজীবন কাজ করেছেন। তাঁর কারণেই নারীরা ধর্মকর্মেও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। ত্রিপিটকের থেরীগাথায় ৭৩ জন থেরীর জীবন কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে। তাঁদের জীবন-দর্শন পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি যথাযথভাবে পরিশ্রম করলে যে কেউ সাফল্য অর্জন করতে পারে। তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা এখনও মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর প্রচেষ্টায় ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই আমরা থেরীদের সাফল্যগাথা জানতে পারছি। ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠার কারণে মহাপ্রজাপতি গৌতমী বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

একক কাজ: মহাপ্রজাপতি গৌতমীর গুণাবলির আলোকে তোমার শ্রেণিতে কোনো এক বন্ধুকে তুমি কীভাবে সহযোগিতা করতে চাও লেখো-

অনাথপিন্ডিক

অনাথপিন্ডিক শ্রেষ্ঠী ছিলেন বুদ্ধের একজন প্রখ্যাত গৃহী শিষ্য। যার প্রকৃত নাম ছিল সুদত্ত। তিনি শ্রাবস্তীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল সুমন শ্রেষ্ঠী। তিনি প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সুদত্ত সে সম্পদের অধিকারী হন। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল তাঁর পেশা। অর্থ উপার্জন করলেও তিনি অকাতরে মানবকল্যাণে তা বিলিয়ে দিতেন। তিনিও পিতার মতো অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কোনো অসহায় মানুষ তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে এলে তিনি ফিরিয়ে দিতেন না। উদারভাবে দান দিতেন। তিনি প্রতিদিন গরিব-দুঃখী ও অনাথদের পিন্ড বা খাদ্য দান করতেন। তাঁকে অনাথের বন্ধু বলা হতো । অনাথদের পিন্ড বা আহারসামগ্রী দান করার কারণে তিনি অনাথপিন্ডিক নামে পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতেন। একদিন ব্যবসায়িক কাজে রাজগৃহে গমন করেন। সেখানে তিনি এক শ্রেষ্ঠী বন্ধুর বাড়িতে অবস্থান করেন। বন্ধুর বাড়িতে এসে তিনি বুদ্ধের কথা জানতে পারেন। বুদ্ধ তখন রাজগৃহের বেনুবনে অবস্থান করছিলেন। বুদ্ধের সাথে দেখা করতে তিনি সেখানে গেলেন। বুদ্ধের দেখা পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলেন। বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করে একপাশে বসলেন। এখানে তিনি বুদ্ধবাণী শ্রবণ করেন। বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে তিনি প্রীতি সুখ অনুভব করেন। তখন থেকেই তিনি বুদ্ধের শিষ্য হন। ফেরার সময় তিনি বুদ্ধকে শ্রাবস্তী আসার আমন্ত্রণ জানান। বুদ্ধ তাতে সম্মতি জানান।

আনন্দিত মনে অনাথপিন্ডিক শ্রাবস্তী ফিরে আসেন। বুদ্ধকে তিনি কীভাবে সেবা করবেন, কীভাবে আপ্যায়িত করবেন তা ভাবতে লাগলেন। বুদ্ধকে কোথায় রাখবেন সে বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শ্রাবস্তীর একটি উৎকৃষ্ট জায়গা তিনি খুঁজতে লাগলেন। যেখানে তিনি বুদ্ধের জন্য একটি বিহার নির্মাণ করবেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানতে পারলেন শ্রাবস্তির রাজকুমার জেত-এর একটি সুন্দর উদ্যান রয়েছে। তিনি রাজকুমারের সাথে দেখা করে সে উদ্যানটি ক্রয় করতে চাইলেন। সে উদ্যানে বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করার কথা রাজকুমারকে জানান। অনাথপিন্ডিকের অনুরোধে রাজকুমার রাজি হন। অবশেষে বহু কোটি স্বর্ণমুদ্রা খরচ করে উদ্যানটি ক্রয় করেন। সেই উদ্যানে মনোরম জেতবন বিহার নির্মাণ করান। সেখানে আলাদাভাবে বুদ্ধের থাকার ব্যবস্থা করেন। ভিক্ষুসংঘের থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভবন নির্মাণ করান। সেখানে বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখেন। বুদ্ধ যেন নির্বিঘ্নে রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তী আসতে পারেন, তার সুব্যবস্থা করলেন। বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীতে আসেন, তখন তিনি মহাসমারোহে জেতবন বিহারে বুদ্ধকে স্বাগত জানান।

চিত্র ১৬: বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে শ্রেষ্ঠী অনাথপিন্ডিকের বিহার দান

ধর্মের প্রচার-প্রসারে অনাথপিণ্ডিকের অবদান

বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে জেতবন বিহারের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘকে এই জেতবন বিহার দান করেন। বিহার দানের উৎসব তিন মাস ধরে চলমান ছিল। অনাথপিণ্ডিক ছিলেন বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি প্রতিদিন বিহারে যেতেন এবং বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনতেন। বিহারে প্রতিদিন ভিক্ষুদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করতেন। বুদ্ধ এই বিহারে উনিশটি বর্ষাবাস যাপন করেন। এ বিহারে অবস্থান করেই বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে ধর্মপ্রচার করেন। ভিক্ষুসংঘের জন্য বিনয়ের বেশ কিছু নিয়ম বুদ্ধ এই বিহারেই প্রবর্তন করেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বুদ্ধ এই বিহারে দেশনা করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিত এ বিহারে দীক্ষা নেন। একসময় এই বিহার বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার-প্রসারের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়। অনাথপিণ্ডিকের এ সকল অবদান তাঁকে ইতিহাসে চির অমর করে রেখেছে।

একক কাজ: অনাথপিণ্ডিকের মতো বন্ধু/পরিবার/সমাজের কল্যাণে তুমি কী কী করতে পারো সে সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখো-

জীবনচরিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা

এই অধ্যায়ে আমরা উপালি থের, মহাপ্রজাপতি গৌতমী এবং অনাথপিণ্ডিকের জীবনী পাঠ করেছি। তাঁদের জীবনাদর্শ, গুণাবলি ও অবদানের কথা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিনয়ধর উপালি থের'র জীবনী পাঠ করে আমরা অধ্যাবসায়ের সুফল সম্পর্কে জানতে পারি। বুদ্ধের সময় নাপিত বংশের মানুষকে সম্মানের চোখে দেখা হতো না। তাদেরকে ধর্মকর্ম এবং শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হতো। কিন্তু বুদ্ধ নাপিত-পুত্র উপালিকে তাঁর সংঘে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয় শাক্য রাজকুমারদের আগে তাঁকে দীক্ষা দান করেন। উপালি থের কঠোর সাধনা করে সাফল্যের শীর্ষে উন্নীত হয়েছিলেন। উপালি থের'র জীবনী থেকে জানতে পারি মানুষ জন্মের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হয় না, কর্মের দ্বারাই শ্রেষ্ঠ হয়। সৎ প্রচেষ্টা থাকলে যে কেউ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর জীবনী আমাদেরকে দুঃখের মধ্যে হতাশ না হতে শেখায়। ধৈর্য সহকারে কাজ করতে শেখায়। তিনি নারীদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে

অবদান রাখেন। মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের কল্যাণ করা প্রভৃতি ছিল তাঁর চরিত্রের অনন্য দিক। তিনি বুদ্ধের অনুমতিক্রমে ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠা করে নারী জাতিকে দুঃখ মুক্তির পথ দেখিয়ে ছিলেন। সর্বোপরি তাঁর জীবনী আমাদের নেতৃত্ব দিতে শেখায়। অপর দিকে অনাথপিন্ডিকের জীবনী আমাদেরকে নিঃস্বার্থভাবে দান দিতে উদ্বুদ্ধ করে। ধর্মের জন্য, গরিব, দুঃখী এবং অসহায় মানুষের হিতের জন্য অকাতরে দান দিতে শেখায়। এসব আদর্শবান মানুষের জীবনী পাঠে আমরা তাঁদের জীবন ও কর্মের নানান দিক সম্পর্কে জানতে পারি। তাঁরা সকলেই ছিল উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁদের জীবনী মানুষকে সৎ, ন্যায় ও কুশল কাজে অনুপ্রাণীত করে। সুতরাং এসব মহান ব্যক্তির আদর্শ অনুসরণ করলে সততা, পরিশ্রম, অধ্যাবসায়, ধৈর্য, ত্যাগ, সংযম, পরোপকার প্রভৃতি গুণ অর্জন সম্ভব। তাই আমাদের মহান এবং আদর্শবান ব্যক্তিদের জীবনচরিত অনুসরণ করা আবশ্যক।

প্রদর্শন: একজন আদর্শ ব্যক্তির গুণাবলি লিখে পোস্টার পেপারে প্রদর্শন করো-

একক কাজ: আদর্শ ব্যক্তির গুণসমূহ তুমি কীভাবে অনুশীলন করবে লেখো-

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিই :

১। উপালি থের প্রথম সংগীতিতে কী আবৃত্তি করেন ?

ক) বিনয় খ) সূত্র গ) অভিধর্ম ঘ) বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

২। মহামায়ার মৃত্যুর পর সিদ্ধার্থকে লালন পালন করেন কে?

ক) মন্তানি খ) মহাপ্রজাপতি গৌতমী

গ) উৎপল বর্ণা ঘ) ক্ষেমা

৩। অনাথপিন্ডিক গৌতম বুদ্ধকে কোন বিহার দান করেন?

ক) পূর্বারাম বিহার খ) শালবন বিহার গ) জেতবন বিহার ঘ) বেণুবন বিহার

৪। কে নারীদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে অবদান রাখেন?

ক) মহাপ্রজাপতি গৌতমী খ) বিশাখা গ) সুজাতা ঘ) ক্ষেমা

৫। অনাথপিন্ডিকের প্রকৃত নাম কী ছিল?

ক) সুমন খ) মৃগার গ) ধনঞ্জয় ঘ) সুদত্ত

খ. শূন্যস্থান পূরণ করি:

১। বুদ্ধ জেতবন বিহারে উনিশটি _____ যাপন করেন।

২। বুদ্ধ সর্বপ্রথম _____ কে দীক্ষা প্রদান করেন।

৩। ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠার কারণে _____ বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

৪। অনাথপিন্ডিক বহু কোটি স্বর্ণ মুদ্রা খরচ করে _____ ক্রয় করেন।

৫। অনাথপিন্ডিকের জীবনী আমাদেরকে নিঃস্বার্থভাবে দান দিতে _____ করে।

গ. মিল করি:

বাম পাশ	ডান পাশ
১। উপালি ছিলেন	ক) দুঃখ মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।
২। বুদ্ধ এক ধর্ম সভায় ভিক্ষুণীদের মধ্যে	খ) বুদ্ধের একজন প্রখ্যাত গৃহী শিষ্য।
৩। অনাথপিন্ডিক শ্রেষ্ঠী ছিলেন	গ) সাফল্যের শীর্ষে উন্নীত হয়েছিলেন।
৪। স্বামীর মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী	ঘ) মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করেন
৫। উপালি থের কঠোর সাধনা করে	ঙ) বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম।

ঘ. শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নির্ণয় করি:

১। বিনয়ধর মানে নীতিজ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। অনাথপিন্ডিক শ্রাবস্তীর অধিবাসী ছিলেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। শাক্য রাজপুত্রদের পরে উপালি দীক্ষা গ্রহণ করেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। মহাপ্রজাপতি গৌতমী প্রথম ভিক্ষুণী ছিলেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। উপালি থের দ্বিতীয় সংগীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। মহাপ্রজাপতি গৌতমী বুদ্ধের কাছে কী প্রার্থনা করেছিলেন?

২। উপালি থের'র জীবনী পাঠে আমরা কী শিক্ষা পাই?

৩। উপালি থেরকে বিনয়ধর বলা হয় কেন ?

৪। সুদত্ত শ্রেষ্ঠীকে কেন অনাথপিন্ডিক বলা হয়?

৫। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর জীবনী থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

চ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১। ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠায় মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অবদান ব্যাখ্যা করো।

২। অনাথপিন্ডিকের মতো বুদ্ধ, পরিবার, সমাজের কল্যাণে তুমি কী কী করতে পারো সে সম্পর্কে লেখো।

৩। রাজপুত্রদের আগে পূর্ণকে দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল- এর থেকে তুমি কী শিক্ষা পাও?

৪। বুদ্ধবাণী সংকলনে উপালি থের'র ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

৫। আদর্শ জীবনচরিতের আলোকে কীভাবে মানুষের উপকার করবে বর্ণনা করো।

তৃতীয় অধ্যায়

দশশীল, দান ও কর্মফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

দশশীল

এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে যা আছে –

- ‘দশশীল’ পরিচিতি
- পালিতে দশশীল
- বাংলায় দশশীল
- শীল পালনের সুফল

শীল

একক বা দলগত কাজ: বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কোন কোন শীল পালন করে একক বা দলগতভাবে তার একটি তালিকা তৈরি করো–

শীলের তালিকা
১. পঞ্চশীল ২. ৩.

তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে পঞ্চশীল ও অষ্টশীল আবৃত্তি করতে পেরেছ। এ পাঠে তোমরা দশশীল পালি ও বাংলায় আবৃত্তি করতে পারবে।

‘শীল’ শব্দের অর্থ হচ্ছে চরিত্র, স্বভাব, নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলা । সকল কুশল কর্মের আধার শীল। যার দ্বারা মনের দুঃখ নির্বাপিত হয়ে শীতল হয়, তার নাম শীল। বৌদ্ধধর্মে শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক সংযমকে শীল বলা হয়। ত্রিপিটকে নানা প্রকার শীলের উল্লেখ আছে, যেমন: পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল ও প্রাতিমোক্ষ সংবরণ শীল ইত্যাদি।

চিত্র ১৭: পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনসহ ভিক্ষুসংঘের সামনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ

নিলয় বড়ুয়া পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। সে তার বাবা, মা, দাদু ও ঠাকুরমার সাথে একত্রে বাস করে। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় সবার সাথে বন্দনা করে। সবাই নিয়মিত পঞ্চশীল গ্রহণ এবং পালন করে। সে খুব ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছে প্রতিটি পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে তার দাদু ও ঠাকুরমা অষ্টশীল গ্রহণ করেন। অষ্টশীলকে উপোসথ শীলও বলা হয়। নিলয় নিয়মিত বড়োদের সাথে বিহারে যায় এবং ভিক্ষুর দেশনা শুনে। একদিন ভিক্ষুর দেশনায় শুনেছে প্রতিটি গৃহীকে জীবনে একবার হলেও শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা নিতে হয়। শ্রমণ হওয়ার জন্য কমপক্ষে সাত বছর বয়স হতে হয়। ভিক্ষু হওয়ার প্রথম স্তর হচ্ছে শ্রমণ। শ্রমণ হয়ে কমপক্ষে এক সপ্তাহ বিহারে থাকতে হয়। দশশীল শ্রমণদের নিত্য পালনীয় শীল। যারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তাদের শ্রমণ বলে। শ্রমণ ও শ্রামণীগণ দশশীল পালন করেন। এজন্য দশশীলকে ‘প্রব্রজ্যা শীল’ বলা হয়। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ প্রাতিমোক্ষ সংবরণ শীল পালন করেন। গত মাসে তার দাদু ও ঠাকুরমা ভারত হতে তীর্থভ্রমণ করে এসেছেন। এই উপলক্ষে তাদের বাড়িতে সংঘদানের আয়োজন করা হবে। নিলয় এই সুযোগে পরিবারের গুরুজনদের কাছে তার প্রব্রজ্যা নেওয়ার আগ্রহের কথা জানাল। তাদের স্কুলে শীতকালীন ছুটি চলছে। তার বাবা বিহারের বড়ো ভান্তেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে নিলয়ের আগ্রহের কথা জানান। নিলয়ের আগ্রহের কথা শুনে ভান্তে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং সম্মতি দিলেন। সংঘদানের আগের দিন বিহারে উৎসবমুখর পরিবেশে নিলয়কে প্রব্রজ্যা দান করা হয়।

একক বা দলগত কাজ: তোমরা বিহারে কাউকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে দশশীল পালন করতে দেখেছ? অভিজ্ঞতাটি একক বা দলগতভাবে বর্ণনা করো-

দশশীল

বিপুল চাকমা পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাড়ি কাপ্তাই উপজেলায়। গত ডিসেম্বর মাসে তার বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণির ক্লাস শুরু হতে আরও ১০/১২ দিন বাকি আছে। বাবা-মা'র অনুমতি পেয়ে পরীক্ষার পরেই সে চিৎমরম বৌদ্ধ বিহারে এক সপ্তাহের জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় এখন বিপুলকে বিহারে থাকতে হয়। এখন সে সাধারণ গৃহী হতে কয়েকটি শীল বেশি পালন করে এবং সংযত জীবনযাপন করে। শ্রমণদের পালনীয় শীলকে 'দশশীল' বলা হয়।

একক বা দলগত কাজ: এককভবে বা দলে আলোচনা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো-

প্রশ্ন	উত্তর
১। শ্রমণগণ কোথায় থাকেন?	
২। শ্রমণ-শ্রামণীদের নিত্য পালনীয় শীল কয়টি ?	
৩। তাঁরা দুপুর ১২টার পর হতে পরের দিন সকাল পর্যন্ত কী কী খেতে পারেন?	
৪। শ্রমণগণ কোন শীল পালন করেন?	

বুদ্ধ নির্দেশিত দশটি নিয়ম বা নীতিকে দশশীল বলে। মহাকারুণিক বুদ্ধ শ্রমণ-শ্রামণীদের জন্য দশশীল প্রবর্তন করেন। দশশীল শ্রমণ-শ্রামণীদের নিত্য পালনীয় শীল।

দশশীল: পালি

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
২. অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৩. অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৫. সুরামেরয-মজ্জ-পমাদট্ঠনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৬. বিকাল ভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৭. নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসুকদস্সনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৮. মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ মণ্ডন বিভূসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৯. উচ্চাসযন-মহাসযনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
১০. জাতরূপ রজত পটিগ্গহনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

দশশীল: বঙ্গানুবাদ

১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
২. অদত্তবস্তু গ্রহণ (চুরি) থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৩. অব্রহ্মচর্য (অশুচি যৌনাচার) থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৪. মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৫. সুরা-মদ নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৬. বিকালে ভোজন থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৭. নৃত্য-গীত-বাদ্য উৎসব প্রভৃতি প্রমত্ত চিত্তে দর্শন থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৮. মাল্যধারণ, সুগন্ধ দ্রব্য লেপন, প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার, অলংকার ব্যবহার থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৯. উচ্চাসন ও মহাশয্যায় শয়ন থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
১০. সোনা-রূপা গ্রহণ থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

ভূমিকাভিনয়: শিক্ষার্থীরা একজন ভান্তে এবং অন্যরা শ্রমণ-শ্রামণী হয়ে শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে ভান্তেকে অনুসরণ করে দশশীল পালি ও বাংলায় আবৃত্তি করবে-

শীল পালনের সুফল

উসুইমা মার্মা ও অনুপমা বড়ুয়া সহপাঠী। তারা দুজন বান্ধবী এবং এক পাড়ায় থাকে। প্রতিদিন একসাথে স্কুলে যায় ও অবসর সময়ে খেলাধুলা করে। আজ বাংলা নববর্ষ। তাদের স্কুল ছুটি। সকাল সকাল দুই বান্ধবী ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে নতুন পোশাক পরে গুরুজনদের সাথে বৌদ্ধ বিহারে গেল। এরপর বুদ্ধের উদ্দেশে বন্দনা নিবেদন করে এবং ভান্তের নিকট শীল গ্রহণ করে। ভান্তে সকলের উদ্দেশে শীল পালনের সুফল দেশনা করেন।

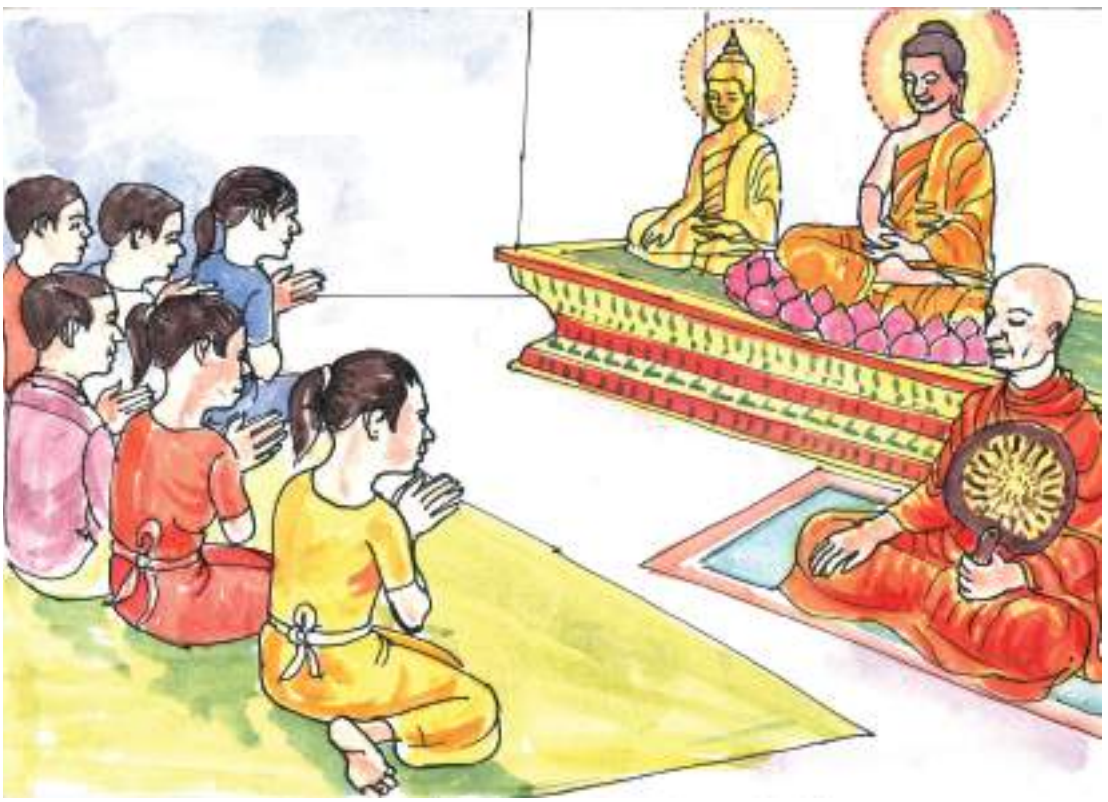

চিত্র ১৮: উপাসক-উপাসিকাদের ভান্তের ধর্ম দেশনা

ভান্তে এভাবে দেশনা করলেন– একদিন বুদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য পাটলিগ্রামে যান। গ্রামবাসী উপাসক-উপাসিকারা বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংঘকে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দান করেন। বুদ্ধ আহার শেষ করে তাঁদের উদ্দেশে শীল পালনের সুফল বর্ণনা করেন। শীল পালনের সুফলগুলো নিম্নরূপ:

১। শীলবান ব্যক্তি শীল পালনের ফলে সৎ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করে।

২। শীল পালনের ফলে শীলবানদের সুনাম-সুকীর্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

৩। যেকোনো সভায় নির্ভয়ে, সসম্মানে উপস্থিত হন।

৪। শীল পালনকারী মৃত্যুকালে সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেন।

৫। মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে থাকেন।

৬। তাঁরা অপরের উপকার সাধন করে পুণ্য অর্জন করেন।

৭। তাঁদেরকে সকলে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করেন।

৮। শীল পালনকারী ব্যক্তি মন্দকাজকে 'না' বলার দক্ষতা অর্জন করেন।

শ্রমণের কাজের তথ্য: একক বা দলগতভাবে কাছের কোনো বিহারে গিয়ে একজন শ্রমণের দৈনিক কাজের তথ্য সংগ্রহ করবে। এজন্য নিচের ছকটি ব্যবহার করা যেতে পারে-

কী কী করে থাকেন	কী কী করা থেকে বিরত থাকেন

পোস্টার উপস্থাপন: শ্রমণের থেকে পাওয়া তথ্য শ্রেণিতে জানা দশশীল এর সাথে কতটুকু মিলেছে যাচাই করো। শ্রমণ শীল পালনের ফলে কী কী সুফল অর্জন করবে তা পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করো-

শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির একজন পন্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি বান্দরবানের শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করেন। বিহারে নতুন শ্রমণদের তিনি সকাল-সন্ধ্যায় দশশীল প্রদান করেন । দশশীল প্রদানের পর তিনি শ্রমণদের করণীয় ও পালনীয় বিষয়ে মূল্যবান দেশনা প্রদান করেন।

১। তোমরা কখনো বৌদ্ধ ভিক্ষুকে শ্রমণদের উদ্দেশে দেশনা করতে দেখেছ?

২। দেশনা শোনার সময় শ্রমণরা কীভাবে বসেন?

৩। শ্রমণরা কয়টি শীল পালন করেন?

দশশীলের গুরুত্ব

এবার তোমরা দশশীলের গুরুত্ব শোনো।

দশশীল শ্রমণদের পালন করতে হয়। শ্রমণকে শিক্ষানবিশও বলা হয়। শ্রমণ-শ্রামণীরা বিহারে বসবাস করে অভিজ্ঞ ভিক্ষুর নির্দেশনায় নৈতিক ও আদর্শ জীবনযাপন অনুশীলন করেন। ধর্মের ব্যবহারিক ও দার্শনিক জ্ঞান অর্জন করেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য পালনীয় পঞ্চশীল এবং অষ্টশীলের সাথে আরও দুটি অতিরিক্ত শীল রয়েছে এই দশশীলে। শীল পালন করলে নৈতিক জীবন গঠন করা যায়। শীল পালনকারী ব্যক্তি কোনো অপরাধ বা মন্দ কাজ করে না। সৎ জীবনযাপন করে। তিনি প্রাণিহত্যা, চুরি, অপহরণ, মাদক সেবন ইত্যাদি করেন না। মিথ্যা কথা বলেন না। ভোগ-বিলাস বর্জন করেন। কোনোরকম অলংকার-প্রসাধন ব্যবহার করেন না। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সংসার ত্যাগী, তাঁরা সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করেন না। ত্যাগ ও সংযমের মাধ্যমে তাঁরা বুদ্ধ প্রদর্শিত পথে দুঃখ মুক্তির জন্য সাধনা করেন। শ্রমণ-শ্রামণীরাও দশশীল পালনের মাধ্যমে শুদ্ধ জীবনযাপনের অভ্যাস গঠন করেন, যা তাঁদের দুঃখ মুক্তির সাধনার জন্য প্রস্তুত করে। দশশীল পালন করে শ্রমণ-শ্রামণীরা বিশুদ্ধ জীবনযাপনের অভ্যাস গঠন করেন। এজন্যই দশশীল শ্রমণ-শ্রামণীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ধারণাচিত্র: সঠিক শব্দ দিয়ে খালি ঘর পূরণ করো-

একক কাজ: শীল পালনের ফলে তোমার জীবনে কী পরিবর্তন হতে পারে লেখো-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কঠিন চীবর দান

এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যা আছে–

- চীবর পরিচিতি
- কঠিন চীবর দান
- কঠিন চীবর দানের সুফল

চিত্র ১৯ক: চীবর

কঠিন চীবর দান

একক বা দলগত কাজ: একক বা দলে আলোচনা করে নিজের দেখা কঠিন চীবর দান সম্পর্কে লেখো-

চিত্র ১৯খ: কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান

বৌদ্ধধর্মে দানের গুরুত্ব অপরিসীম। নিঃস্বার্থভাবে যা দেওয়া হয় তা-ই দান। দান করা একটি মহৎ কাজ। ধনী-গরিব সবাই দান করতে পারে। অনেক মানুষ দান করে মহৎ বা স্মরণীয় হয়েছেন। যে কোনো সময় যে কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীকে দান করা যায়। তবে শীলবান ভিক্ষুসংঘকে দান করাই হচ্ছে উত্তম দান। দানের ফল কখনো বৃথা যায় না। দানের দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়। লোভ দূর হয়। ইহকাল ও পরকাল সুখের হয়। দান স্বর্গ লাভের সোপান। তাই সকলের দান করা উচিত।

বৌদ্ধধর্মে নানা রকম দান অনুষ্ঠান রয়েছে। যেমন– সংঘদান, অষ্টপরিস্কার দান, কঠিন চীবর দান প্রভৃতি । আজকের পাঠে আমরা কঠিন চীবর দান সম্পর্কে জানব।

বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্যে কঠিন চীবর দান অন্যতম। বর্তমানে কঠিন চীবর দানোৎসব জাতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। এ দান উপলক্ষ্যে বৌদ্ধরা ধর্মীয় সম্মেলনেরও আয়োজন করে থাকে। এ দানকে জ্ঞাতি সম্মেলনও বলা যায়। অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান বছরের যেকোনো সময় করা যায়। কিন্তু কঠিন চীবর দান বছরে একটি বিহারে শুধুমাত্র একবার করা যায়। অনেক ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে এ দান করতে হয়।

যে বিহারে ভিক্ষু বর্ষাবাস পালন করেন, শুধুমাত্র সে বিহারেই কঠিন চীবর দান করা যায়। আষাঢ়ী পূর্ণিমা হতে আশ্বিনী পূর্ণিমার পূর্বদিন পর্যন্ত বর্ষাবাস গ্রহণ করার উপযুক্ত সময়। এ তিন মাসকে ওয়া মাসও বলা হয়। বর্ষাবাস করার জন্য ভিক্ষুদের বিনয় অনুসরণ করতে হয়।

আশ্বিনী পূর্ণিমার পরের দিন হতে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত এক মাস কঠিন চীবর দান করা যায়। এ দান অনুষ্ঠানে বিহারের বর্ষাবাস গ্রহণকারী ভিক্ষুসহ আরও কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুকে ফাং করতে হয়। দান উপলক্ষ্যে পুণ্যার্থীরা চীবর ও অন্যান্য দানীয় সামগ্রী নিয়ে বিহারে সমবেত হন। প্রথমে দায়ক-দায়িকাগণ ভিক্ষুসংঘের নিকট থেকে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। ত্রিচীবরের মধ্যে যেকোনো একটি চীবর ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে 'ইমং কঠিন চীবরং ভিক্খুসংঘস্স দেমা পূজেমা কঠিনং অত্থরিতুং' গাথাটি তিনবার উচ্চারণ করে উৎসর্গ করা হয়। ভিক্ষুগণ দানকৃত এ চীবর সীমাঘরে নিয়ে কর্মবাচা পাঠ করে বিহারে বর্ষাবাস যাপনকারী ভিক্ষুকে প্রদান করেন।

কঠিন চীবর দান উপলক্ষ্যে বিহারকে মনোরম সাজে সাজানো হয়। সকালে সংঘদান করা হয়। ধর্মসভায় প্রাজ্ঞ ভিক্ষুসংঘ কঠিন চীবর দানের মহাফল সম্পর্কে দেশনা করেন। সভায় বৌদ্ধদর্শন, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়েও আলোচনা করা হয়। ধর্ম আলোচনায় দেশের বরেণ্য পণ্ডিত ভিক্ষু ও গৃহীরা অংশগ্রহণ করেন।

এ দানোৎসবে নানা সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রীয় ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সারাদিন নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর সকলে ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনায় ব্যস্ত থাকে। রাতে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক কীর্তন, নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

সমাজে বাস করতে হলে নিজেদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে হয়। পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠলে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। পরস্পর মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ পরস্পরের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। এতে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ হয়।

কঠিন চীবর দানের সুফল

আজ রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে শুভ কঠিন চীবর দান। কঠিন চীবর দান উপলক্ষ্যে বিহারে সাজ সাজ রব। এক সপ্তাহ আগে থেকে বিহার প্রাঙ্গণ মনোরম সাজে সাজানো হয়েছে। দুপুর ১২টার পর হতে বিহারের মাঠ উপাসক-উপাসিকাদের উপস্থিতিতে কানায় কানায় ভরে গিয়েছে। হাজার হাজার বৌদ্ধ নর-নারীর সমাগমে বিকালের ধর্মসভা পরিপূর্ণ। ধর্মাসনে দেশ-বিদেশ হতে প্রায় পাঁচশত পণ্ডিত ভিক্ষুসংঘ উপস্থিত হয়েছেন। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন বিহারের আবাসিক প্রধান শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির এবং প্রধান ধর্মদেশক হিসেবে উপস্থিত আছেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জ্ঞানসেন মহাস্থবির। তিনি ধর্মদেশনায় কঠিন চীবর দানের সুফল বর্ণনা করেছেন।

কঠিন চীবর দানের ফল অপরিসীম। বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগিত স্থবির কঠিন চীবর দানের সুফল বর্ণনা করে বলেছেন–

১। কোনো দাতা অন্যান্য দানীয় বস্তু যদি এক শত বছর ধরে দান করে, তবুও একটি কঠিন চীবর দানের ১২ ভাগের ১ ভাগ হয় না।

২। কোনো দাতা যদি এক শত বছর পর্যন্ত ভিক্ষুদের ব্যবহারের জন্য অষ্টপরিস্কার দান করে, তার ফল কঠিন চীবর দানের পুণ্য ফলের ১৬ ভাগের ১ ভাগ হয় না।

৩। কোনো দায়ক যদি সুমেরু পর্বতের সমান স্তূপ করে ভিক্ষুসংঘকে ত্রিচীবর দান করে, তার ফল কঠিন চীবর দানের ১৬ ভাগের ১ ভাগ হয় না।

৪। কোনো দাতা যদি সোনা, রুপা, রত্নখচিত ৮৪ হাজার বিহার নির্মাণ করে ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে দান করে তাও একটি কঠিন চীবর দানের পুণ্য ফলের ১৬ ভাগের ১ ভাগ হয় না।

৫। পৃথিবীর সকল প্রকার দানীয় বস্তু একত্র করে দান করলেও একটি কঠিন চীবর দানফলের ১৬ ভাগের ১ ভাগ হয় না।

৬। সর্বজ্ঞ বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ ও বুদ্ধ-শিষ্যগণ সকলেই কঠিন চীবর দানের সুফল লাভ করেছেন।

৭। যে ব্যক্তি কঠিন চীবর সেলাই করেন তিনিও অসংখ্য পুণ্যফল ভোগ করেন।

৮। কঠিন চীবর লাভী ভিক্ষুগণ পাঁচটি পাপ হতে রক্ষা পায় ও পাঁচটি পুণ্যফল ভোগ করেন।

এজন্য কঠিন চীবর দানের ফল অন্যান্য যেকোনো দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

অনুচ্ছেদ লেখা: কঠিন চীবর দানকে 'কঠিন' বলা হয়– এই বিষয়ের উপর একটি অনুচ্ছেদ লেখো-

সূত্র : –কঠিন চীবর দানের উপযুক্ত ভিক্ষু কে?

–চীবর কীভাবে প্রস্তুত হয়?

–চীবর দানের জন্য কী কী নিয়ম অনুসরণ করতে হয়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কর্ম ও কর্মফল

এ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে যা আছে–

- কর্মফল
- কুশল কর্ম ও অকুশল কর্ম-সম্পর্কিত কাহিনি
- কুশল ও অকুশল কর্মের মধ্যে পার্থক্য
- অকুশল কর্মের পরিণাম

কর্ম ও কর্মফল

তালিকা তৈরি: একক বা দলে আলোচনা করে তোমরা প্রতিদিন যে কাজগুলো করে থাকো, তার একটি তালিকা তৈরি করো-

প্রতিদিনের কাজের তালিকা
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

আমরা প্রতিদিন যা কিছু করি, তা-ই কর্ম। ভালো বা মন্দ, সব কাজেরই ফল আছে। ভালো কাজ করলে ভালো ফল এবং খারাপ কাজ করলে খারাপ ফল ভোগ করতে হয়। কথায় আছে যেমন কর্ম, তেমন ফল। কর্মের দ্বারা উন্নত জীবন যেমন লাভ হয়, তেমনি কর্মের দ্বারা হীন জীবনও লাভ হয়। এ ধারণাকে কর্মবাদ বলে। বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি হলো কর্মবাদ।

কর্মই প্রাণীদের একান্ত আপন। কর্মই বন্ধু, কর্মই প্রকৃষ্ট আশ্রয়। কর্মের কারণেই প্রাণী অহরহ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হচ্ছে।

কেউ কাউকে সুখ বা দুঃখ দিতে পারে না। যার দুঃখ সে নিজেই সৃষ্টি করে। নিজের ভালো কর্মের জন্য নিজেই সুখ ভোগ করে। মন্দ কর্মের জন্য দুঃখ ভোগ করে। নিজের দুঃখ বা দুর্ভাগ্যের জন্য কাউকে

দায়ী করা যায় না। মা-বাবা, ভাই-বোন ও পরম কল্যাণমিত্র কেউ পাপীকে রক্ষা করতে পারে না। বুদ্ধ বলেছেন– নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা, অপর কেউ নয়। স্বর্গ বা নরক জীবের নিজেদেরই কর্মের পরিণতি। সেজন্য বলা যায়–

যেরূপ করিবে কাজ ফল তার পাবে
আপনার কর্মফল কেমনে এড়াবে?
নিম গাছ লাগালে ফলবে না আম
ভেবেচিন্তে তাই সবে করো কুশল কাজ।

বুদ্ধ চেতনাকে কর্ম বলেছেন। কায়-মন-বাক্য দ্বারা চেতনা সংগঠিত হয়। ক্ষণিকের চেতনা অন্তহীন সুখ বা দুঃখ ভোগের কারণ। তাই সব সময় কুশল চিন্তা করতে হয়। কুশল চেতনা বা চিন্তার মাধ্যমে সৎকর্ম করা হয়।

তোমরা নিজ কর্মে সংযত ও দায়িত্ববান হবে। নিজের দুঃখের জন্য কাউকে দোষারোপ করবে না। অপরের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। কাউকে হিংসা, ঘৃণা ও অসম্মান করবে না। সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকবে। কুশল কর্মের দ্বারা সুন্দর জীবন গঠন করা যায়।

কুশল কর্মের কাহিনি

সুমন চাকমা পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। তার বাবা পাহাড়ে জুম চাষ করেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। তার মা সংসারের উন্নতির জন্য তাঁতের কাপড় বোনেন। একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে সুমন একটি টাকা ভর্তি ব্যাগ দেখতে পেলো। সে টাকার ব্যাগটি নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের হাতে তুলে দিলো। প্রধান শিক্ষক স্কুলের দৈনিক সমাবেশে সকলকে সুমনের টাকাভর্তি ব্যাগ পাওয়ার ঘটনাটি বললেন। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য বলেন, 'যিনি টাকা হারিয়েছেন, তিনি যেন উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে টাকার ব্যাগ বুঝে নেন'। সকলে সুমনের সততার প্রশংসা করলো। পরদিন রমিজ মিয়া নামে একজন রিকশাচালক প্রমাণ দিয়ে টাকা ভর্তি ব্যাগটি প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে নিয়ে যান। রমিজ মিয়ার স্ত্রী দীর্ঘদিন থেকে জটিল রোগে ভুগছিলেন। তিনি টাকাগুলো তাঁর স্ত্রীর অপারেশনের জন্য হাসপাতালে জমা দিতে যাওয়ার পথে হারিয়ে ফেলেছিলেন। হারানো টাকা ফেরত পেয়ে তিনি খুবই খুশি হলেন এবং উপস্থিত সকলের সামনে সুমনকে ধন্যবাদ দিলেন।

একক কাজ: দলে আলোচনা করে কুশল কর্মের ফল সম্পর্কিত কোনো জানা ঘটনা লেখো–

আজ আমরা কুশল কাজের ফল কেমন হয় তার একটি কাহিনি পড়ব।

অতীতে রাজগৃহে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। সপরিবারে পঞ্চশীল ও উপোসথ শীল পালন করতেন। বোধিসত্ত্ব ছিলেন ওই পরিবারে গৃহকর্মী। এক উপোসথ দিবসে তিনি দূরের জমিতে চাষ করতে গেলেন। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখলেন, সবাই উপোসথ গ্রহণ করেছে। পড়ন্ত বেলা। গৃহকর্মী বোধিসত্ত্ব না খেয়েই অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এটি ছিল তাঁর অর্ধ উপোসথ।

গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমে গৃহকর্মী ক্লান্ত। ক্ষুধা তাড়িত। পেটে ব্যথাও অনুভব করলেন। পেটের ব্যথা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। গৃহকর্মীর আর্তনাদ শুনে গৃহকর্তা তাঁকে মধু সেবন করতে বললেন। গৃহকর্তা বললেন এগুলো খেলে শীল ভঙ্গ হবে না। ধার্মিক গৃহকর্মী তা-ও গ্রহণ করলেন না। কারণ অর্ধবেলার উপোসথ তিনি যথাযথভাবে পালন করবেন।

পরদিন সকালবেলা। রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা। বারাণসীরাজ নগর ভ্রমণে বের হয়েছেন। প্রিয়দর্শন রাজার রাজসিক জ্যোতি, অপূর্ব বেশভূষা দেখে মুমূর্ষু বোধিসত্ত্বের মনে প্রবল বাসনা হলো তিনিও রাজা হবেন। এ অবস্থায় বোধিসত্ত্বের মৃত্যু ঘটে।

শীলবানের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে না । মৃত্যুর পর তিনি জন্ম নিলেন বারাণসী রাজমহিষীর রাজকুমার রূপে। নাম রাখা হল উদয় কুমার। মেধাবী কুমার বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করলেন। পিতার মৃত্যুর পর স্বর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করলেন উদয় কুমার।

চিত্র ২০: মৃত্যুশয্যায় শায়িত গৃহকর্মীর সামনে সুসজ্জিত বারাণসীরাজের নগর ভ্রমণ

দলগত কাজ: দলে আলোচনা করে কুশল কর্মের পাঁচটি সুফল লেখো-

অকুশল কর্মের পরিণাম

এক ছিল রাখাল বালক। সে প্রতিদিন পাহাড়ে গরু চরাতো। পাহাড়ের পাদদেশে মাঠে কাজ করতেন কয়েকজন কৃষক। একদিন সন্ধ্যায় রাখাল বালক চিৎকার করে বলতে লাগল, 'আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, বাঘ বাঘ বাঘ!' কৃষকেরা তাকে বাঁচানোর জন্য পাহাড়ে উঠে দেখলেন কোনো বাঘ আসেনি। সে তাদের সাথে মজা করছিল। দ্বিতীয় দিনও দুষ্ট রাখাল বালক বাঘ বাঘ বলে তাকে বাঁচানোর জন্য চিৎকার করল। কৃষকেরা তাকে সাহায্যের জন্য পাহাড়ে উঠে দেখল, সে আগের দিনের মতোই তাঁদের সাথে মজা করছে। তৃতীয় দিন সত্যি সত্যি বাঘ এলো। সে ভয় পেয়ে জোরে জোরে চিৎকার করে তাকে বাঁচানোর জন্য কৃষকদের আকুতি জানাল; কিন্তু কৃষকেরা মনে করল সে আগের দিনগুলোর মতো তাদের সাথে মজা করছে। তাই তারা কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলো না। বাঘ রাখাল বালককে মেরে ফেললো। দুষ্ট রাখাল এভাবেই তার মিথ্যা বলার শাস্তি পেল। একেই বলে যেমন কর্ম, তেমন ফল। অকুশল কর্মের পরিণাম কখনোই ভালো হয় না।

দলগত কাজ: তোমরা দলে আলোচনা করে অকুশল কর্মের পরিণাম সম্পর্কিত একটি ঘটনা লেখো-

অকুশল কর্মের কাহিনি

একদা বুদ্ধ জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। বহু সংখ্যক ভিক্ষু বুদ্ধকে দর্শন করতে সেখানে যাচ্ছিলেন। তখন এক মহিলা চুলার আগুনে রান্না করছিলেন। হঠাৎ রান্নাঘরের আগুন ছড়িয়ে পড়ে উড়ন্ত একটি কাক অগ্নিদগ্ধ হলো। কাকটি তাঁদের সামনেই পড়ে মারা গেল। ভিক্ষুসংঘ জেতবন বিহারে এসে এ বিষয়ে বুদ্ধকে জানালেন। তখন বুদ্ধ কাকের অতীত জন্মের পাপকর্মের ব্যাখ্যা করলেন।

অতীতকালে বারাণসীতে এক কৃষকের একটি গরু ছিল। কৃষক গরুটিকে কিছুতেই দমন করতে পারছিলেন না। কোনো কাজই করানো সম্ভব হচ্ছিল না। ছড়ি দিয়ে আঘাত করে হাঁটানো গেলেও, কিছুদূর গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। শত চেষ্টা করেও কাজে লাগাতে না পেরে কৃষক খুবই ক্রোধান্বিত হলো। তখন কৃষক গরুটির গলায় শুষ্ক খড় বেঁধে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিল। গরুটি আগুনে দগ্ধ হয়ে সেখানেই মারা গেল। এই অগ্নিদগ্ধ কাক ছিল অতীতের সেই গরুর মালিক। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেছেন–

"মানুষ হোক বা পশু-পক্ষী হোক সকলকেই পাপের ফল ভোগ করতে হয়।"

চিত্র ২১: কৃষক গরুর গলায় শুষ্ক খড় বেঁধে আগুন লাগিয়ে দিল

আমরা যে দুটি গল্প পড়লাম, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে মন্দ কাজের ফল কখনো ভালো হয় না। অকুশল কাজের পরিণতিতে শাস্তি পেতে হয়। ভালো বা কুশল কাজ করলে সুফল বা পুরস্কার পাওয়া যায়।

একক কাজ: কুশল কাজ করার ফলে তোমাদের জীবনে যেসব পরিবর্তন এসেছে তা লেখো-

কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের মধ্যে পার্থক্য

তালিকা তৈরি: দলে আলোচনা করে তোমরা যা করো (ভালো) এবং যা করা থেকে বিরত থাকো (মন্দ) সে সব কাজের তালিকা তৈরি করো–

ভালো কাজ	মন্দ কাজ
১. সকল জীবে দয়া করা।	১. চুরি করা।
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

ভালো কাজকে কুশল কর্ম বলে। ভালো কাজ করলে সকলের প্রিয় হয়। সকলে প্রশংসা করে। জীবন সার্থক হয়। পুণ্য লাভ হয়। ভালো কাজ করলে মন প্রসন্ন হয়। ধার্মিক ও পুণ্যবান ব্যক্তিকে সবাই সম্মান ও প্রশংসা করে। এটা ধার্মিক ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সুকর্ম সুখকর ও আনন্দদায়ক। পুণ্যকর্মে দীর্ঘায়ু লাভ হয়। ধার্মিক ব্যক্তিদের জন্য স্বর্গের দ্বার খোলা থাকে। পুণ্যবান ব্যক্তির নির্বাণ লাভের পথ সহজ হয়। গুরুজনকে সম্মান করা, জীবে দয়া করা, শীল পালন করা ইত্যাদি কুশল কর্মের অন্তর্গত।

মন্দ কাজকে অকুশল কর্ম বলে। যারা অকুশল কর্ম করে তাদের কেউ ভালোবাসে না। সমাজে অবহেলা ও নিন্দার পাত্র হয়। অকুশল কর্মে পাপ উৎপন্ন হয়। পাপী ব্যক্তিদের মনে শান্তি থাকে না। তারা মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে। তারা জীবের হিত ও মঙ্গল কামনা করে না। পাপ কর্মের ফল ইহজীবনে ভোগ করতে হয়। মৃত্যুর পর নরকে গমন করে। লোভ করা, হিংসা করা, অপরের ক্ষতি করা ইত্যাদি অকুশল কর্ম। বুদ্ধ সব সময় কুশল কর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন। তোমরা সব সময় কুশল কর্ম বা ভালো কাজ করার চেষ্টা করবে । অকুশল বা মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।

একক বা দলগত কাজ: একক বা দলে আলোচনা করে কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখো-

কুশল কর্ম	অকুশল কর্ম
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

ভূমিকাভিনয়: শিক্ষার্থীরা অকুশল বা মন্দ কাজের তালিকা করবে। মন্দ কাজ করে শাস্তি পেয়েছে এমন একটি গল্প লিখবে। গল্পটি শ্রেণিতে অভিনয় করে দেখাবে। শিক্ষক মনিটর করবেন এবং নির্দেশনা দেবেন।

চিত্র ২২ : অকুশল বা মন্দ কাজকে 'না' বলা

একক বা দলগত কাজ: একক বা দলে আলোচনা করে তোমরা কোন কোন অকুশল কর্মকে 'না' বলবে, তা লেখো এবং প্রদর্শন কর। এর একটির উদাহরণ দেওয়া হলো-

১. অন্যের জিনিস না বলে নেবো না।
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিই :

১। দশশীল কারা পালন করেন?
ক) গৃহীরা খ) ভিক্ষুরা গ) শ্রমণরা ঘ) সন্ন্যাসীরা

২। শীল পালনকারী ব্যক্তি কেমন জীবনযাপন করেন?
ক) সৎ খ) অসৎ গ) ভালো ঘ) মন্দ

৩। কোন দানকে জ্ঞাতি সম্মেলনও বলা হয়?
ক) অষ্টপরিস্কার দান খ) সংঘদান গ) কল্পতরু দান ঘ) কঠিন চীবর দান

৪। কোন দান বছরে একটি বিহারে শুধুমাত্র একবার করা যায়?
ক) সংঘ দান খ) অষ্টপরিস্কার দান গ) কঠিন চীবর দান ঘ) মধু দান

৫। 'কর্মবাদ' কোন ধর্মের মূল ভিত্তি?
ক) বৌদ্ধধর্ম খ) জৈনধর্ম গ) ইহুদিধর্ম ঘ) হিন্দুধর্ম

খ. শূন্যস্থান পূরণ করি:

১। যারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তাদের _____ বলে।

২। শীল পালন করলে _____ গঠন করা যায়।

৩। যে বিহারের ভিক্ষু _____ পালন করেন সে বিহারে কঠিন চীবর দান করা যায়।

৪। কর্মই প্রকৃষ্ট _____।

৫। যারা অকুশল কর্ম করে তাদেরকে কেউ _____ না।

গ. মিল করি:

বাম পাশ	ডান পাশ
১। দশশীল শ্রমণদের	ক) কখনই ভালো হয় না।
২। ফলে শীলবানদের শীল পালনের	খ) মহৎ কাজ।
৩। দান করা একটি	গ) নিত্য পালনীয় শীল।
৪। অকুশল কর্মের পরিণাম	ঘ) দুঃখ ভোগ করে।
৫। মন্দ কর্মের জন্য	ঙ) সুনাম-সুকীর্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

ঘ. শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নির্ণয় করি:

১। "পাণাতিপাতা" শব্দের অর্থ হলো প্রাণী হত্যা। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। স্বার্থের জন্য যা দেওয়া হয় তাই দান। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। অকুশল কর্মের পরিণাম ভয়াবহ। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। সকলেই কর্মের অধীন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। কঠিন চীবর দান বছরে বহুবার করা যায়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। কী কারণে প্রাণী অহরহ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হচ্ছে?

২। দশশীলকে কেনো প্রব্রজ্যা শীল বলা হয়?

৩। কঠিন চীবর দানের পাঁচটি সুফল লেখো।

৪। শীল পালন করে তোমার কী উপকার হয়েছে লেখো।

৫। অকুশল কর্মের পরিণাম কী লেখো।

চ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১। শীল পালনের সুফলগুলো ব্যাখ্যা কর।

২। কুশল ও অকুশল কর্মের পার্থক্যগুলো লেখো।

৩। 'দশশীল' বাংলায় অনুবাদ কর।

৪। দুষ্ট রাখাল বালকের গল্পটি পড়ে তুমি কী শিক্ষা লাভ করেছো তা বর্ণনা করো।

৫। তোমার দেখা একটি কঠিন চীবর দানের বর্ণনা দাও।

৬। অকুশল কর্মের পরিণাম জেনে তুমি কীভাবে অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকবে?

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও মহাতীর্থ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বন্দনা ও ধর্মীয় উৎসব

এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে যা আছে–

- সপ্ত মহাস্থান বন্দনা
- বোধি বন্দনা
- মধু পূর্ণিমার তাৎপর্য
- প্রবারণা পূর্ণিমার গুরুত্ব
- আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের উপকারিতা

সপ্ত মহাস্থান বন্দনা

চিত্র ২৩: সপ্ত মহাস্থানের অন্যতম বোধিপালঙ্ক-এর প্রতি গৌতম বুদ্ধের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধত্ব লাভের পরে ৪৯ দিন বোধিবৃক্ষের আশপাশে সাতটি স্থানে অবস্থান

করেন। এই সাতটি স্থানে তিনি তাঁর বুদ্ধত্ব লাভের আনন্দ উদযাপন করেন। স্থানসমূহ হচ্ছে বোধিপালঙ্ক, অনিমেষ স্থান, চংক্রমণ স্থান, রতনঘর স্থান, অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ, মুচলিন্দ এবং রাজায়তন বৃক্ষ।

১) বোধিপালঙ্ক – বুদ্ধ বুদ্ধগয়ায় যে অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে বসে ধ্যান সাধনা এবং বুদ্ধত্ব লাভ করেন, সে স্থানকে বোধিপালঙ্ক বলা হয়। এ আসনটিই সকল বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পবিত্র স্থান। এই স্থানে বুদ্ধ সাত দিন অবস্থান করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

২) অনিমেষ স্থান - বোধিপালঙ্ক থেকে কিছুটা উত্তর-পূর্ব কোণে অনিমেষ স্থান অবস্থিত। এই স্থানে বসে বুদ্ধ সাত দিন অপলক দৃষ্টিতে বোধিবৃক্ষের দিকে তাকিয়ে থেকে বোধিবৃক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

৩) চংক্রমণ স্থান – বোধিপালঙ্ক এবং অনিমেষ স্থানের মাঝামাঝি যে বেদিটি আছে, তা চংক্রমণ (পদচারণা) স্থান নামে পরিচিত। বুদ্ধত্ব লাভের পরে তৃতীয় সপ্তাহ বুদ্ধ এখানে চংক্রমণ করেন।

৪) রতনঘর স্থান– বোধিপালঙ্কের সোজা উত্তর-পশ্চিম পাশে কিছুটা দূরে রতনঘর স্থান অবস্থিত। বুদ্ধ এখানে সাত দিন ধ্যানস্থ ছিলেন।

৫) অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ– এই বৃক্ষটি বোধিপালঙ্কের সোজা পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই বৃক্ষের নিচে ছাগল পালকেরা তাদের ছাগলসহ বিশ্রাম নিত বলে এই গাছের নাম অজপাল ন্যাগ্রোধ। অজ শব্দের অর্থ ছাগল। বুদ্ধ অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ তলে এক সপ্তাহ ধ্যান করেন।

৬) মুচলিন্দ - বোধিপালঙ্কের উত্তর-পূর্ব দিকে এই স্থান, এখানে নাগরাজ বাস করতেন। ধ্যানস্থ বুদ্ধকে নাগরাজ বেষ্টনী করে ঝড়-বৃষ্টি, পোকা-মাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। এখানে বুদ্ধ এক সপ্তাহ ধ্যান করেন।

৭) রাজায়তন স্থান– বোধিপালঙ্কের দক্ষিণ-পূর্বে এবং মুচলিন্দের উত্তরে এই স্থান। এখানে রাজায়তন নামে একটি পাহাড়ি গাছ ছিল, তাই এটি রাজায়তন স্থান নামে পরিচিত। বুদ্ধ এখানেও এক সপ্তাহকাল ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন।

এই সাতটি স্থান বৌদ্ধদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। বৌদ্ধরা প্রতিদিন এই সপ্ত মহাস্থানের উদ্দেশে বন্দনা করেন। এই বন্দনাকে 'সপ্ত মহাস্থান বন্দনা' বলা হয়। আমরা এখন সপ্ত মহাস্থান বন্দনাটি আবৃত্তি অনুশীলন করব।

সপ্ত মহাস্থান বন্দনা

পঠমং বোধিপলঙ্কং, দুতিযং অনিমিসম্পি চ,
ততিযং চঙ্কমণং সেট্ঠং, চতুত্থং রতনঘরং,
পঞ্চমং অজপালঞ্চ, মুচলিন্দঞ্চ ছটঠমং,
সত্তমং রাজাযতনং, বন্দে তং বোধিপাদপং।

বাংলা অনুবাদ
প্রথম স্থান বোধিপালঙ্ক, দ্বিতীয় অনিমেষ,
তৃতীয় চংক্রমণ স্থান, চতুর্থ রতনঘর,
পঞ্চম অজপাল মূল, ষষ্ঠ মুছলিন্দ,
সপ্তম রাজায়তন, বন্দি সপ্ত স্থানে।

বোধি বন্দনা

অনোমা তার ছোটো ভাই সুমনকে নিয়ে এক বিকালে বৌদ্ধ বিহারে গিয়েছে। বিহারে অনন্য সুন্দর বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে দুই ভাই-বোন বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের উদ্দেশে বন্দনা করল। বন্দনা করার সময় তারা ত্রিরত্ন বন্দনা শুদ্ধ উচ্চারণে, উচ্চ স্বরে আবৃত্তি করল। কাছেই ছিলেন ওই বিহারের একজন ভন্তে। তিনি অনোমা ও সুমনকে সুন্দর করে ত্রিরত্ন বন্দনা আবৃত্তি করার জন্য প্রশংসা করলেন। তারা ভন্তেকেও বন্দনা করল। এ সময় ওরা ভিক্ষু বন্দনার মাধ্যমে ভন্তেকে বন্দনা করেছিল। ভন্তে এবার তাদেরকে বিহারের আঙ্গিনায় বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করে আসতে বললেন। সুমন ভন্তেকে জিজ্ঞাসা করল, ভন্তে! বোধিবৃক্ষ কী? ভন্তে বললেন, বিহারে যে বড়ো অশ্বত্থ গাছ রয়েছে, এই গাছকেই বৌদ্ধরা মহাবোধি বা বোধিবৃক্ষ বলে। 'বোধি' শব্দের অর্থ জ্ঞান। বুদ্ধগয়ায় অবস্থিত এই অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে ধ্যান সাধনা করে গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করেন। সকল বৌদ্ধ বিহারেই সাধারণত একটি বোধিবৃক্ষ থাকে, বৌদ্ধরা এখানে ভক্তি সহকারে পানি ঢালে এবং বন্দনা করে। এ সময় তারা মহাবোধি বন্দনা আবৃত্তি করে। এরপরে অনোমা ও সুমন ভন্তের সাথে বিহারের বোধিবৃক্ষের কাছে যায় এবং ভন্তের নির্দেশ অনুসারে পানি ঢেলে বোধি বন্দনা আবৃত্তি করে, বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করে।

চিত্র ২৪: উপাসক-উপাসিকাদের বোধি বন্দনা

বোধি বন্দনা

যস্সমূলে নিসিন্নো'ব, সব্বারি বিজযং অকা।
পত্তো সব্বঞ্ঞুতং সখা বন্দে তং বোধিপাদপং।
ইমেহে তে মহাবোধি লোকনাথেন পূজিতা।
অহম্পিতে নমস্সামি বোধিরাজ নমত্থুতে।

বাংলা অনুবাদ

যে বোধিবৃক্ষের মূলে বসে বুদ্ধ সব ধরনের শত্রুকে পরাজিত করে সর্বজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, সেই বোধিবৃক্ষকে আমি বন্দনা করছি। এই মহাবোধি বৃক্ষ লোকনাথ বুদ্ধ কর্তৃক পূজিত, আমিও সেই বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করছি। হে বোধিরাজ, তোমায় নমস্কার।

প্রদর্শন: আমরা এখন পোস্টার পেপারে/মোটা কাগজে বোধি বন্দনাটি লিখবো। দেয়ালে/বোর্ডে প্রদর্শন করবো। সমস্বরে পাঠ করবো। এবার না দেখে খাতায় লেখো-

মধু পূর্ণিমা

চিত্র ২৫: বুদ্ধকে হাতির কলা দান

চিত্র ২৬ : বুদ্ধকে বানরের মধু দান

একসময় গৌতম বুদ্ধ পারল্যিয় নামে বনে বাস করছিলেন। সেখানে তিনি প্রতিদিন ধ্যান অনুশীলন করতেন। বুদ্ধকে ধ্যান করতে দেখে একটি হাতি তাঁকে কলা দান করেছিল। হাতিকে কলা দান করতে দেখে একটি বানর ভাবতে থাকে, সে কী দান করতে পারে। অনেক ভেবে সে মধু দান করবে বলে ঠিক করে। তখন বানর একটা আস্ত মৌচাক নিয়ে এসে বুদ্ধের সামনে রাখে; কিন্তু ওই মৌচাকে অনেক মৌমাছি থাকায় বুদ্ধ মধু পান করতে পারেননি। বানর তা বুঝতে পেরে মৌমাছি তাড়িয়ে পরিষ্কার মধু বুদ্ধকে দান করল। বুদ্ধ এবার সেই মধু পান করলেন। বুদ্ধকে মধু পান করতে দেখে বানর তো মহাখুশি। খুশিতে এ গাছ থেকে ওই গাছে লাফিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। দানের আনন্দে বানর পরম তৃপ্তি পেল। বানরের মধু দানের এই ঘটনা স্মরণ করে বৌদ্ধরা ভাদ্র পূর্ণিমায় ভিক্ষুদের মধু দান করে। এই দিনটিকে মধু পূর্ণিমা বলা হয়।

মধু পূর্ণিমার তাৎপর্য

মধু পূর্ণিমার তাৎপর্য অপরিসীম। মধু পূর্ণিমার শিক্ষা মানুষের মনে দান চেতনা জাগ্রত করে। সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী, করুণা, ভালোবাসা ও সম্প্রীতি প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করে। সেবা ও ত্যাগে উৎসাহিত করে। এ কারণে বৌদ্ধরা মধু পূর্ণিমা দিবসটি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে পালন করে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মধু পূর্ণিমা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

প্রবারণা পূর্ণিমা

তাপস তঞ্চঙ্গ্যা পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। তার বোন সুনন্দা সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। দুই ভাই-বোন গ্রামে মামার বাড়ি গিয়েছে। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, দিদিমা কলাপাতায় পিঠা বানিয়েছে। সবাই সকালে পিঠা খেয়েছে। মামাতো ভাই পিন্টুর সাথে ওরা পাড়ার বৌদ্ধ বিহারে গেল। বুদ্ধমূর্তির সামনে বন্দনা করল। বিহারে অবস্থিত বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করল। এরপরে ওরা বিহারের চত্বরে কিছু ছেলে-মেয়েকে দেখতে পেল। পিন্টু বলল, চল, ওরা কী করছে দেখে আসি। গিয়ে দেখল, ছেলে-মেয়েরা সবাই ফানুস বানাচ্ছে। সামনে প্রবারণা পূর্ণিমা, বিহার সাজানো হচ্ছে নানারকম সরঞ্জাম দিয়ে। চারিদিকে সাজ সাজ রব।

তাপস পিন্টুকে জিজ্ঞাসা করল, দাদা প্রবারণা পূর্ণিমা কবে?

পিন্টু: আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথিতে প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হয়।

তাপস: প্রবারণা পূর্ণিমায় আমরা কী করি?

পিন্টু: আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে তিন মাস ভিক্ষুদের বর্ষাবাস পালন শেষে প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হয়। বর্ষাবাস হলো আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এই তিন মাস ভিক্ষুরা বিহারে অবস্থান করে ধর্মীয় নিয়ম-কানুন পালন করেন। এই সময় সাধারণত তাঁরা ধর্ম প্রচারে বিহারের বাইরে অবস্থান করেন না। বর্ষাবাস শেষে প্রবারণার পর থেকেই ভিক্ষুগণ দিকে দিকে গমন করে ধর্মোপদেশ দেন। এজন্যই এই প্রবারণা উৎসব আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই দিন আমরা খুব সকালে স্নান করে পরিষ্কার পোশাক পরে বিহারে যাই। বিহারে গিয়ে ভিক্ষু বন্দনা করি। বিভিন্ন প্রকার উপকরণ– ফুল, পানি, খাদ্যবস্তু ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের উদ্দেশে উৎসর্গ করি। পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গ্রহণ করি। জল ঢেলে পুণ্যদান করি। ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান বা আহার দান করি। অনেকে অষ্টশীলসহ উপোসথ পালন করে। বিহারে সমবেত সকল আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করি।

সুনন্দা: এখানে ছেলে-মেয়েরা কী করছে?

পিন্টু: ওরা ফানুস বানাচ্ছে। এই ফানুসগুলো প্রবারণার দিন সন্ধ্যায় আকাশে উড়ানো হবে। কীর্তন-শিল্পীরা ঢোল-মন্দিরা-মৃদঙ্গ-কাসর বাজিয়ে গান করবেন। সবাই আনন্দ করে দেখতে আসবে। আকাশে অসংখ্য ফানুস তারার মতো জ্বলতে দেখা যাবে।

সুনন্দা ও তাপস একসঙ্গে: বাহ! আমরাও দেখব তো!

পিন্টু: নিশ্চয়ই। তোমরা জানো তো, প্রকৃষ্টরূপে বারণ ও বরণই হলো প্রবারণার মূল শিক্ষা। আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে আষাঢ়ী পূর্ণিমা হতে তিন মাস ধ্যান সমাধির মাধ্যমে বর্ষাবাস যাপন শেষে আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথিতে কনিষ্ঠ ভিক্ষুগণ জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর নিকট দোষ-ত্রুটি স্বীকার করেন। উক্ত তিন মাসে নিজের দ্বারা কোন দোষ-ত্রুটি হয়ে থাকলে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিন মাস বর্ষাবাসের মাধ্যমে কুশল, ভালো, মঙ্গল ও পরোপকারের শিক্ষা গ্রহণ করেন। এসকল কল্যাণকর কর্ম বহুজনের হিত ও সুখের নিমিত্তে প্রচার করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকেই প্রবারণা বলা হয়।

প্রবারণার গুরুত্ব

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রবারণা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাই পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের পাশাপাশি তিন মাসব্যাপী দায়ক-দায়িকা, উপাসক-উপাসিকাও অষ্টমী, অমাবস্যা-পূর্ণিমা তিথিতে উপোসথ শীল গ্রহণ ও পালন করেন। এই তিন মাস ধ্যান সমাধির মাধ্যমে চিত্ত পরিশুদ্ধ করতে সচেষ্ট থাকেন। পরিবার ও সমাজে এর ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রবারণা পূর্ণিমার ধর্মীয় উৎসব সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করে এবং আন্তঃসম্প্রীতি সমৃদ্ধ করে। এর দ্বারা অসাম্প্রদায়িক চেতনা সুদৃঢ় হয়। প্রবারণা উৎসব একটি অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব। এতে সকল সম্প্রদায়ের লোক যোগদান করে আনন্দ উপভোগ করে। তাই ধর্মীয় এবং সামাজিক দিক দিয়ে প্রবারণার গুরুত্ব ব্যাপক ও অপরিসীম।

সবাই একসঙ্গে: আমরা সবাই প্রবারণা পূর্ণিমায় বিহারে যাব, আনন্দের সাথে উৎসব করব।

চিত্র ২৭: প্রবারণা পূর্ণিমায় ফানুস উড়ানো উৎসব

একক কাজ: আগামী প্রবারণা পূর্ণিমায় তুমি কী কী করবে তার একটি পরিকল্পনা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো-

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের উপকারিতা

তাপস আর সুনন্দা খুব খুশি, আজ প্রবারণা পূর্ণিমা। মা ওদের সাজিয়ে দিয়েছে, ওরা বিহারে যাবে। কত আনন্দ করবে! সকালে বিভিন্ন ধরনের খাবার খেয়েছে। বিহারেও অনেক মজার খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। অনেক আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা হবে। পাশের বাসার সুনন্দার সহপাঠী রুনা আর তার ছোটো ভাই রুবেল বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে। সুনন্দা তাপসকে বলল, চলো আমরা তাদের প্রবারণার শুভেচ্ছা জানাই। তারা পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাল। বিকালে একসাথে ফানুস ওড়ানো দেখলো। ফানুসগুলো দূর আকাশে উড়ে গিয়ে একেকটি তারা হয়ে জ্বলছে, কী সুন্দর দেখাচ্ছে, তাই না! নানা রঙের কাগজে তৈরি ফানুস আকাশে উড়ছে, হাজার তারার আলো ছড়াচ্ছে। এভাবেই মানুষ নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে এবং অন্যদের সাথেও উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেবে।

আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ছাড়াও অন্য ধর্মের অনুসারী বাস করে। যেমন- খ্রিষ্টধর্ম, সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি অন্যতম। তাপস, সুনন্দা আর পিন্টুরও অনেক বন্ধু আছে, যারা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী। তারা সবাই পরস্পরের ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করে অনেক আনন্দ উপভোগ করে। খ্রিষ্টানদের আছে বড়দিন। প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে এই দিবসটি উদযাপিত হয়। তাদের অন্যান্য আরও উৎসবের মধ্যে ইস্টার সানডে উল্লেখযোগ্য। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসবের মধ্যে শারদীয় দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি উল্লেখ্য। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বড়ো উৎসব হিসেবে ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা ও ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি উদ্‌যাপন করে। এ উৎসবসমূহ সকল ধর্মের অনুসারীরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় উদ্‌যাপন করে। এর মাধ্যমে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। পরস্পরের ধর্ম সম্পর্কে জেনে বৈচিত্র্যের প্রতি আগ্রহ এবং সম্মানবোধ সৃষ্টি হয়। এভাবেই আমরা মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সমাজে বসবাস করি। বাগানে যেমন অনেক আকার ও রঙের ফুল ফোটে, তেমনি দেশ ও সমাজে নানা ধর্মের বিশ্বাসী মানুষ বাস করে। নানা রঙের ফুল যেমন বাগানের সৌন্দর্য বাড়ায়, তেমনি নানা ধর্মের মানুষ এ বিশ্বকে বৈচিত্র্যময় করেছে।

ঘটনা বলা: বন্ধুদের সাথে ধর্মীয় উৎসবের আনন্দ করেছো এরকম কোনো ঘটনা বলো-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চারি মহাতীর্থ

এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যা আছে–

- চারি মহাতীর্থ পরিচিতি
- তীর্থ ও মহাতীর্থের পার্থক্য
- লুম্বিনীর ভৌগোলিক অবস্থান ও ধর্মীয় গুরুত্ব
- বুদ্ধগয়ার অবস্থান ও ধর্মীয় গুরুত্ব
- প্রথম ধর্মপ্রচারের স্থান হিসেবে সারনাথের গুরুত্ব
- ভৌগোলিক অবস্থানসহ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কুশিনগরের তাৎপর্য
- অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কয়েকটি তীর্থ/পবিত্র স্থান

তীর্থ ও মহাতীর্থ পরিচিতি

ম্যাম্যাচিং মারমা তীর্থ দর্শনে বুদ্ধগয়া গিয়েছিলেন। সারাজীবন বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ভিক্ষুসংঘকে অনেক দান করেছেন। বুদ্ধগয়া ভ্রমণ করে তিনি বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি জানতেন গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। এবার স্বচক্ষে বুদ্ধগয়া পরিদর্শন করেছেন। তিনি লুম্বিনী, সারনাথ এবং কুশিনগরও গিয়েছেন। লুম্বিনী কাননে সিদ্ধার্থ জন্মলাভ করেন। সারনাথে বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মধ্যে প্রথম ধর্মপ্রচার করেন। কুশিনগরে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধের জীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত চারটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অর্থাৎ জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ, ধর্মপ্রচার এবং মহাপরিনির্বাণ লাভের এসব স্থানকে মহাতীর্থ বলা হয়।

এ চার মহাতীর্থ ছাড়াও বৌদ্ধদের আরও অনেক ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক পবিত্র স্থান আছে। যেমন– কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বৈশালী, রাংকূট, মহামুনি, ময়নামতি, পাহাড়পুর ইত্যাদি। এগুলো বৌদ্ধদের জন্য পবিত্র তীর্থস্থান। মহাতীর্থসমূহ বুদ্ধের জীবনের জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ, প্রথম ধর্মপ্রচার ও মহাপরিনির্বাণ এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মৃতিতে সমৃদ্ধ। তীর্থস্থানসমূহে বুদ্ধের জীবন, তাঁর শিষ্য এবং বৌদ্ধ রাজাদের বিভিন্ন কীর্তিচিহ্ন রয়েছে। এ সকল তীর্থ ও মহাতীর্থ ছাড়াও বৌদ্ধদের আরও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অনেক স্থান রয়েছে, যা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা পরিদর্শন করেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য অন্যরাও এসব স্থান ভ্রমণ করেন।

লুম্বিনী

চিত্র ২৮: গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী

উপরের ছবিতে একটি বৌদ্ধ বিহার এবং পাশে একটি অশোক স্তম্ভ দেখা যাচ্ছে। ২৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লুম্বিনীতে সম্রাট অশোক স্তম্ভটি নির্মাণ করেন। বিহারটি লুম্বিনীতে অবস্থিত। নাম মায়াদেবী টেম্পল। এর সামনে একটি মনোরম পুকুর আছে। আড়াই হাজার বছর আগে সিদ্ধার্থ গৌতম লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের স্থানটি চিহ্নিত করতেই এই অশোক স্তম্ভটি নির্মাণ করা হয়। বৌদ্ধদের মহাতীর্থ লুম্বিনী বর্তমান নেপালের তরাই অঞ্চলে অবস্থিত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে মায়াদেবীর বাবার বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা হয়। তিনি দেবদহ রাজ্যের রাজকন্যা ছিলেন। কপিলাবস্তুর রানি মায়াদেবী দেবদহ ভ্রমণে যাওয়ার পথে লুম্বিনী কাননে বিশ্রাম নিতে যাত্রাবিরতি নেন। মনোরম লুম্বিনী কাননে একটি পুকুরে তিনি স্নান করে যখন জোড়া শালবৃক্ষের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখনই সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম হয়। লুম্বিনী বৌদ্ধদের জন্য অতি পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে পর্যটকরা অশোক স্তম্ভ, মায়াদেবী টেম্পল, পুকুর, বিশ্বশান্তি প্যাগোডা ও লুম্বিনী মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। লুম্বিনীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্মিত বিহার রয়েছে। যেমন– চীন, মিয়ানমার, শ্রীলংকা, ভিয়েতনাম ইত্যাদি। বাংলাদেশ সরকারও এখানে একটি বিহার নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দ নিয়েছে। ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে লুম্বিনীকে বিশ্ব ঐতিহ্য স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রতিবছর সারা বিশ্ব থেকে অনেক তীর্থযাত্রী ও পর্যটক লুম্বিনীতে ভ্রমণ করতে আসেন।

একক কাজ: তুমি কেন লুম্বিনী ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক লেখো-

বুদ্ধগয়া

চিত্র ২৯: বু×গয়ায় মহাবোধি বিহার

বুদ্ধগয়া ভারতের বিহার প্রদেশে অবস্থিত। এ স্থানটির মূল নাম গয়া। সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের স্মৃতি বিজড়িত বলে স্থানটি 'বুদ্ধগয়া' বলে সারা পৃথিবীতে পরিচিত। বুদ্ধগয়া বৌদ্ধদের অন্যতম মহাতীর্থ। আজ হতে আড়াই হাজার বছর আগে সিদ্ধার্থ গৌতম গয়ার নৈরঞ্জনা নদীর তীরে একটি বড়ো অশ্বত্থ গাছের নিচে কঠোর ধ্যান সাধনা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি বুদ্ধত্ব লাভের আগে পাশের সেনানী গ্রামের বধূ সুজাতার পায়েস গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধগয়ায় অবস্থিত মহাবোধি টেম্পল বা বিহার ২০০২ সালে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য স্থানের মর্যাদা পেয়েছে। বুদ্ধগয়ায় বহু দেশ বিহার প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সকল বিহার খুবই সুন্দর ও পবিত্র। ওখানে একটি বাংলাদেশের বিহারও রয়েছে।

তথাগত বুদ্ধ যে অশ্বত্থ গাছের নিচে মহাজ্ঞান লাভ করেছিলেন, সেই গাছটি মহাবোধিবৃক্ষ নামে পরিচিত। 'বোধি' শব্দের অর্থ জ্ঞান। এই বৃক্ষের নিচে সিদ্ধার্থ বোধি বা জ্ঞান লাভ করেন বলেই এর নামকরণ করা হয়েছে মহাবোধি বৃক্ষ। যে আসনে বসে বুদ্ধ ধ্যান করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন সেই আসনের নাম 'বজ্রাসন'। বোধিবৃক্ষের ওই স্থানটিকে বোধিপালঙ্ক বলা হয়। বোধিপালঙ্কটি একটি বড়ো পাথরের টুকরা দিয়ে চিহ্নিত। সম্রাট অশোক এই স্থানটি চিহ্নিত করেছেন। বুদ্ধগয়ায় বোধিপালঙ্কসহ সপ্ত মহাস্থান চিহ্নিত আছে। বুদ্ধগয়ার মহাবোধি বিহার জগদ্বিখ্যাত। এই বিহারে রয়েছে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বুদ্ধের বড়ো মূর্তি। এছাড়া আরও অনেক ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় নিদর্শন বুদ্ধগয়ায় আছে। তীর্থযাত্রীরা এসব স্থান দেখে অনেক জ্ঞান ও পুণ্য অর্জন করে তৃপ্ত হন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা বুদ্ধগয়া ভ্রমণ করে বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম–দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে।

একক কাজ: তোমার পরিচিত একজন তীর্থযাত্রীর বুদ্ধগয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শোনো। তিনি যা বর্ণনা করেছেন, তা লেখো এবং শিক্ষককে দেখাও-

সারনাথ

চিত্র ৩০: সারনাথের ধামেক স্তূপ ও অশোক স্তম্ভ

একক কাজ: উপরের ছবি দুটি দেখে পাঁচটি বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাও-

সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পরে ভাবলেন, এ নতুন জ্ঞানের কথা কাকে প্রচার করবেন! এ সময় তাঁর সারনাথের পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কথা মনে পড়ল। তিনি এই পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের প্রথম ধর্মপ্রচারের সিদ্ধান্ত নিলেন। সারনাথের মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কাছে তথাগত বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন। এজন্যই সারনাথ বৌদ্ধদের অন্যতম মহাতীর্থ। এ স্থানে মৃগ বা হরিণের বিচরণ ক্ষেত্র ছিলো বলে তা 'মৃগদাব' নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীনকালে এই মৃগদাবের নাম ছিল 'ইসিপতন মিগদাব'। বর্তমানে সারনাথ ভারতের উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে অবস্থিত। এখানে সম্রাট অশোক খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে একটি স্তম্ভ ও একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। স্তম্ভটি অশোক স্তম্ভ এবং স্তূপটি 'ধামেক স্তূপ' নামে পরিচিত। স্তূপটির উচ্চতা ৪৩ মিটার।

ছক পূরণ: পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নামগুলো লেখো-

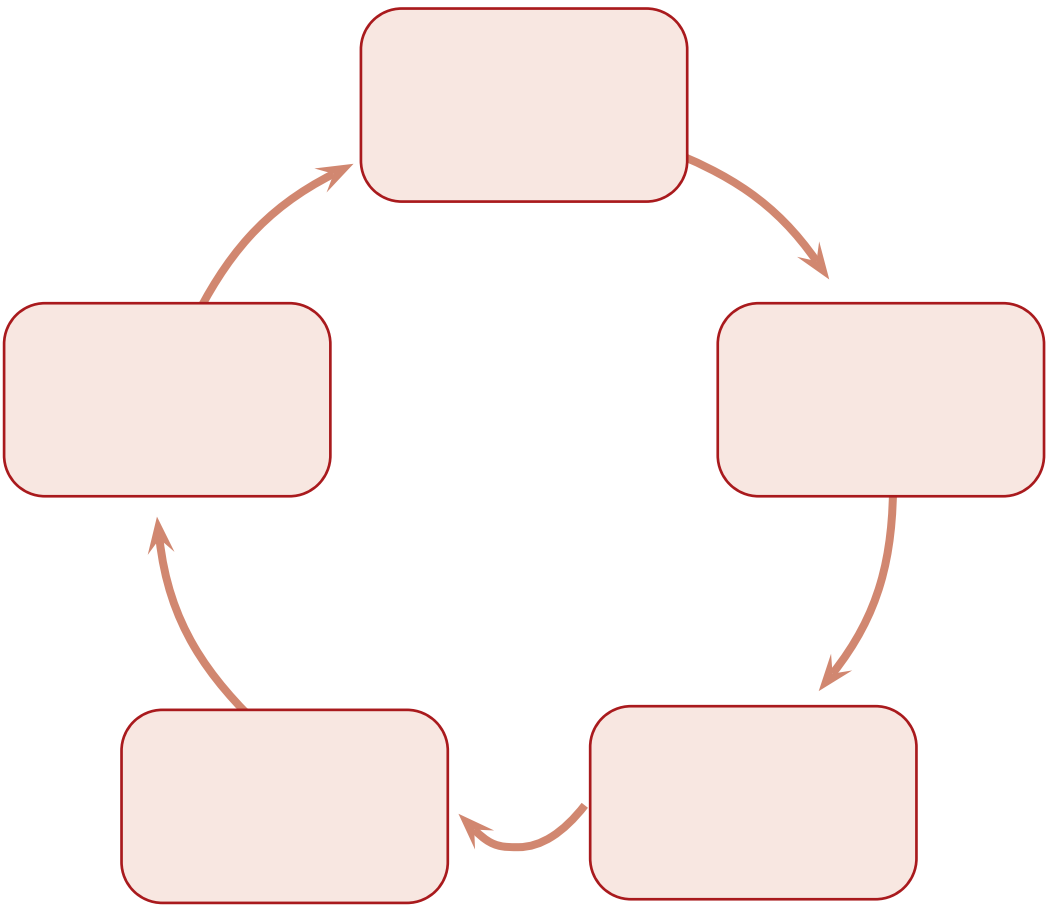

ঐতিহাসিক সারনাথ থেকেই গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্মপ্রচার শুরু করেন। সংঘের যাত্রাও এখান থেকেই শুরু। এরপরে সুদীর্ঘ ৪৫ বছর তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের ইতিহাসে তাঁর প্রথম ধর্মপ্রচারের স্থান হিসেবে সারনাথের নাম অনন্য স্থান অধিকার করে আছে।

কুশিনগর

চিত্র ৩১: কুশিনগরে মহাপরিনির্বাণ বিহার ও স্তূপ

কুশিনগরে গৌতম বুদ্ধ ৮০ বছর বয়সে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। ঐতিহাসিক কুশিনগর বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে অবস্থিত। স্থানটি কুশিনগর জেলা বলে অভিহিত। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে তাঁকে এখানেই সৎকার করা হয়। বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণের আগে শিষ্যদের উদ্দেশ্যে শেষ ধর্মদেশনা করেন, যা 'মহাপরিনির্বাণ সূত্র' বলে পরিচিত। এই স্থানটি বৌদ্ধদের কাছে অন্যতম মহাতীর্থ। এখানে স্তূপ নির্মিত হয়েছে, নাম 'রামাভার স্তূপ'। এছাড়া পরিনির্বাণ স্তূপ, মহাপরিনির্বাণ বিহার ও অন্যান্য বিহার, জাদুঘর, বুদ্ধের নির্বাণ শয্যায় শায়িত মূর্তি প্রভৃতি আছে। আরও আছে বিভিন্ন দেশের উদ্যোগে নির্মিত দৃষ্টিনন্দন বিহার। বিশ্বের নানা দেশ থেকে এখানে তীর্থযাত্রী ও পর্যটকরা ভ্রমণ করতে আসেন। মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের স্থান হিসেবে 'কুশিনগর' বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য অন্যতম মহাতীর্থ। সারা বিশ্বের অগণিত বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ও অন্যরা এ স্থান ভ্রমণ করতে আসে এবং অনেক পুণ্য ও জ্ঞান অর্জন করে। চিত্রে কুশিনগরের অন্যতম দর্শনীয় স্থান 'মহাপরিনির্বাণ বিহার ও স্তূপ' দেখা যাচ্ছে।

ছক পূরণ: নিচের প্রশ্ন অনুসারে তথ্যছকটি পূরণ করো-

১. বুদ্ধের জন্মস্থান কোথায়?
২. বুদ্ধত্ব লাভের স্থান কোথায়?
৩. বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচার স্থান কোথায়?
৪. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ স্থান কোথায়?

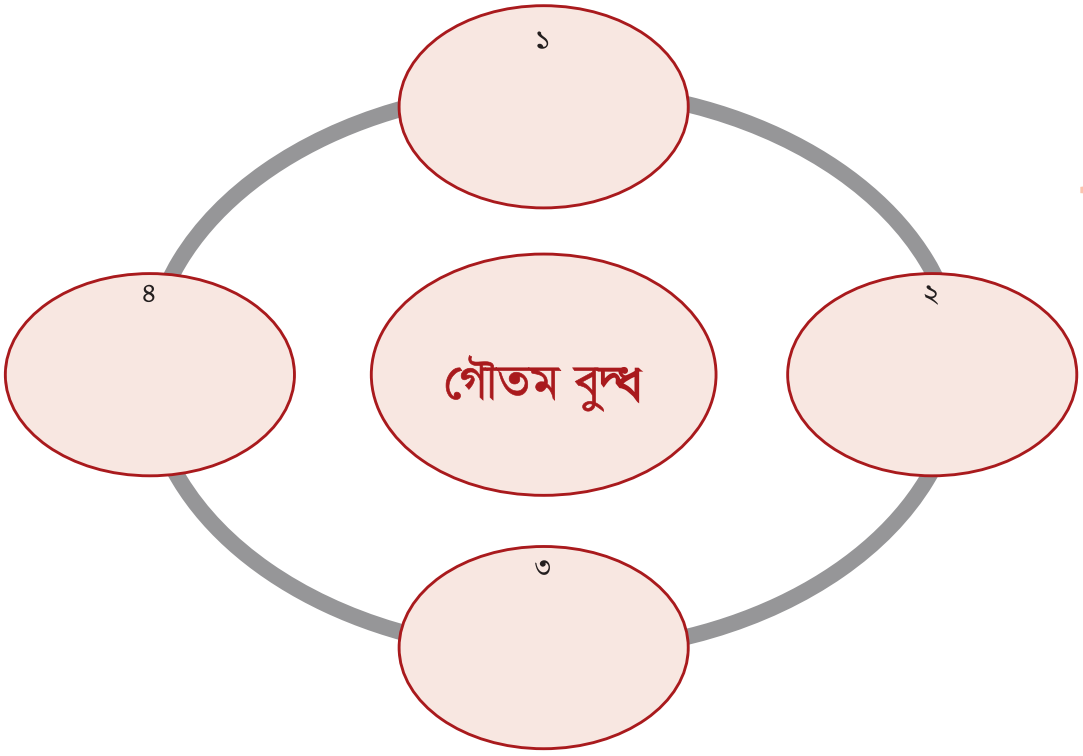

একক কাজ: তুমি কেন কুশিনগর যেতে চাও? তা লিখে শিক্ষককে দেখাও-

তীর্থস্থানের গুরুত্ব

চিত্র: পবিত্র মক্কা শরিফ

চিত্র: শ্রী জগন্নাথ মন্দির, পুরী

চিত্র: পবিত্র ভ্যাটিকান সিটি

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা বসবাস করে। এর মধ্যে ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টধর্ম উল্লেখযোগ্য। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র তীর্থস্থানসমূহের মধ্যে মক্কা ও মদিনা প্রসিদ্ধ। এ স্থানসমূহ মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবে অবস্থিত। প্রতিবছর বহু ইসলাম ধর্মাবলম্বী পবিত্র হজ পালনের জন্য মক্কা ও মদিনায় যান। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থানসমূহের মধ্যে গয়া, কাশী, পুরী, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ ইত্যাদি সুপরিচিত। এ স্থানসমূহ ভারতে অবস্থিত। প্রতিবছর বহু হিন্দু ধর্মাবলম্বী এসব স্থানে তীর্থ করতে যান। খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র তীর্থস্থানসমূহের মধ্যে জেরুজালেমের বেথেলহাম, ইতালির ভ্যাটিকান সিটি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তীর্থস্থান পরিদর্শন করলে মন প্রসন্ন হয়। সকল ধর্মের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা যায়। এর মাধ্যমে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। তীর্থস্থান পরিদর্শন করলে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। তীর্থস্থান দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্যকে বিকশিত করে। দেশি-বিদেশি তীর্থ যাত্রী ও পর্যটক তীর্থস্থান পরিদর্শন করে আনন্দ অনুভব করে এবং জ্ঞান সমৃদ্ধ করে। তাই তীর্থস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। তীর্থস্থান সংরক্ষণে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। পবিত্র তীর্থস্থানসমূহ সকলের জন্য অমূল্য সম্পদ। এ স্থানের পবিত্রতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

ছক পূরণ: নিচের ছকে বিভিন্ন ধর্মের একটি করে পবিত্র তীর্থস্থানের নাম লেখো-

ইসলামধর্ম	হিন্দুধর্ম	বৌদ্ধধর্ম	খ্রিষ্টধর্ম

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিই :

১। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পরে কয়দিন বোধিবৃক্ষের আশপাশে অবস্থান করেন?
ক) ৩৫ খ) ৪২ গ) ৪৯ ঘ) ৫৬

২। প্রবারণা পূর্ণিমার অপর নাম-
ক) বৈশাখী পূর্ণিমা খ) ভাদ্র পূর্ণিমা গ) মাঘী পূর্ণিমা ঘ) আশ্বিনী পূর্ণিমা

৩। উৎসবে যোগদানের সুফল কোনটি?
ক) আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় খ) বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়
গ) আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায় ঘ) দান চেতনা বৃদ্ধি পায়

৪। বুদ্ধ প্রথম কোথায় ধর্ম প্রচার করেন?
ক) বুদ্ধগয়া খ) সারনাথ গ) লুম্বিনী ঘ) বৈশালী

৫। নিচের কোনটি মহাতীর্থস্থান?
ক) শ্রাবস্তী খ) বৈশালী গ) রাজগির ঘ) কুশিনগর

খ. শূন্যস্থান পূরণ করি:

১। বুদ্ধ অজপাল _____ বৃক্ষ তলে প্রথম সপ্তাহ ধ্যান করেন।

২। মৌচাকে অনেক _____ থাকায় বুদ্ধ মধু পান করতে পারেননি।

৩। আমরা মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সমাজে _____ করি।

৪। গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করেন_____ বৃক্ষের নিচে।

৫। তীর্থস্থান পরিদর্শনে _____ প্রসন্ন হয়।

গ. মিল করি:

বাম পাশ	ডান পাশ
১। বুদ্ধকে মধু দানের পর	ক) মানুষ বাস করে।
২। বর্ষাবাস শেষে প্রবারণার পর থেকেই	খ) বিশ্ব ঐতিহ্য স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।
৩। দেশ ও সমাজে নানা ধর্মে বিশ্বাসী	গ) অমূল্য সম্পদ।
৪। ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে লুম্বিনীকে	ঘ) ভিক্ষুগণ দিকে দিকে গমন করে ধর্ম দেশনা দেন।
৫। পবিত্র তীর্থস্থানসমূহ সকলের জন্য	ঙ) বানর পরম তৃপ্তি পেল।

ঘ. শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নির্ণয় করি:

১। বুদ্ধকে ধ্যান করতে দেখে একটি হাতি কলা দান করেছিল। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। প্রবারণা পূর্ণিমায় ভিক্ষুগণ দোষত্রুটির জন্য জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। 'ইস্টার সান ডে' সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসবের নাম। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। তীর্থস্থান পরিদর্শনে অনেক জ্ঞান অর্জন করা যায়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। তীর্থস্থান সংরক্ষণে তীর্থ যাত্রীদের দায়িত্ব নেই। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। বোধিপালঙ্ক কী সংক্ষেপে লেখো।

২। মধু পূর্ণিমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। বৌদ্ধদের চারটি ধর্মীয় উৎসবের নাম লেখো।

৪। মহাতীর্থস্থান বলতে কী বুঝায়?

৫। অন্য ধর্মাবলম্বীদের চারটি উৎসবের নাম লেখো।

চ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১। সপ্তমহাস্থানের বর্ণনা লেখো।

২। প্রবারণা পূর্ণিমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

৩। ধর্মীয় উৎসবে যোগদানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

৪। তীর্থস্থান সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা লেখো।

৫। তীর্থস্থান সংরক্ষণে তুমি কী ভূমিকা রাখতে পারো, তা বর্ণনা করো।

পঞ্চম অধ্যায়

জাতকে জীব ও প্রকৃতি

এ অধ্যায়ে যা আছে –

- নৈতিক ও আর্দশ জীবন গঠনে জাতকের ভূমিকা
- জাতকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব
- সিংহচর্ম জাতকের বিষয়বস্তু ও উপদেশ
- মহাকপি জাতকের কাহিনি ও উপদেশ
- বানরেন্দ্র জাতকের কাহিনি ও উপদেশ
- জাতকের শিক্ষা অনুসরণে প্রকৃতি ও জীবজগতের সুরক্ষা

জাতক

চিত্র ৩২: বুদ্ধ জাতকের গল্প বলছেন

আমরা গল্প পড়তে ও বলতে ভালোবাসি । বৌদ্ধ সাহিত্যে এ রকম অনেক গল্প বা কাহিনি আছে, যা পাঠ করে নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠন করা যায়। তোমাদের সমবয়সী অনেক শিক্ষার্থী গল্প পড়তে ও প্রকৃতির ছবি আঁকতে পছন্দ করে। চলো, আমরা পড়েছি এমন কয়েকটি গল্প বা কাহিনির তালিকা তৈরি করি–

গল্প বা জাতক কাহিনির নাম
১.
২.
৩.
৪.
৫.

এ পাঠে আমরা নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের ভূমিকা ও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব পাঠ করব। জাতক সূত্র পিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের একটি গ্রন্থ। সাধারণ অর্থে 'জাতক' বলতে যে জন্মগ্রহণ করেছে তাকে বোঝায়; কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যে জাতক শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে । গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম বৃত্তান্তকে জাতক বলা হয় । গৌতম বুদ্ধ ধর্মদেশনার সময় শিষ্য ও শ্রোতাদের উদ্দেশে জাতকের কাহিনিগুলো বলতেন। জাতকে বোধিসত্ত্বের পূর্ব জন্মের সৎ কর্মের সুফল ও অসৎ কর্মের কুফল বর্ণনা করা হয়েছে । গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব জীবনে ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে হিসাবে জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি । বর্তমানে বাংলা ভাষায় অনুবাদকৃত জাতক গ্রন্থে ৫৪৭টি জাতক কাহিনি সংকলিত আছে ।

নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের ভূমিকা

নৈতিকতা হলো নিয়ম-নীতি মেনে চলে সুশৃঙ্খল ও সৎ জীবনযাপন করা। মূলত সৎভাবে জীবনযাপন করাই হলো আদর্শ জীবন। আদর্শবান ব্যক্তিকে সবাই সম্মান করে। মৃত্যুর পরও তাঁদের কথা মানুষ যুগে যুগে স্মরণ করে থাকে। তাই আমাদের সকলের উচিত অকুশল ও অনৈতিক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা। কেননা নীতি ও আদর্শহীন ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ করে না। গৌতম বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের সব সময় সৎ, ন্যায়, সংযত এবং নৈতিক জীবনযাপনের উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধ জাতকের কাহিনিগুলো বলতেন ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় কাজের সুফল-কুফল বুঝানোর জন্য। এসব কাহিনির মাধ্যমে তাঁদেরকে নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠনের শিক্ষা দিতেন। জাতকের গল্প মানুষকে শীলবান, দয়াবান, নীতিবান, সত্যবাদী, ক্ষমাপরায়ণ, মৈত্রীপরায়ণ এবং পরোপকারী হতে উদ্বুদ্ধ করে। কায়, বাক্য এবং মন সংযত করে। সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা দূর করতে সহায়তা করে। জীবপ্রেম ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত করে। অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাব গড়ে তোলে। বলা যায়, নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের প্রভাব অপরিসীম। তাই প্রতিটি জাতকের গল্প পাঠ ও এর শিক্ষা অনুসরণ করা উচিত।

তালিকা তৈরি: ভালো কাজ ও মন্দ কাজ নিচের ছকে লেখো-

ভালো কাজ	মন্দ কাজ
সর্বদা সত্য কথা বলা।	মিথ্যা কথা বলা।

জাতকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

জাতকগুলোতে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্মীয়, ভৌগোলিক প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাই জাতককে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উৎস বা আধার হিসেবে গণ্য করা হয়। জাতকের গল্প পাঠে আরো জানা যায় যে, প্রাচীন ভারত ষোলোটি জনপদে বা রাজ্যে বিভক্ত ছিলো। বুদ্ধের সময়ে মগধ, কোশল, বজ্জি, মল্ল, বৈশালী, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বারাণসি প্রভৃতি শক্তিশালী রাজ্য ছিলো। আড়াই হাজার বছর পূর্বের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজ্যশাসন প্রণালি, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি জাতকে বর্ণিত আছে। জাতক সাহিত্যে বিভিন্ন রাজ্য, নগর, বন্দর, রাজন্যবর্গ, শ্রেণি,

বণিক, বিহার, নদ-নদী প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। জাতকে প্রাচীন ভারতের সামাজিক অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। জাতক পাঠে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের জাতিভেদ প্রথা, দাস প্রথা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, পেশা প্রভৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা যায়। প্রাচীন সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও জাতকে নানা ধরনের তথ্য আছে। সে সময়ের শুল্ক ব্যবস্থা, বন্দর, মুদ্রা ব্যবস্থা ও শ্রেণি-পেশা কেমন ছিল তা জাতক পাঠে জানা যায়। সে সময়ের বিচার ব্যবস্থার চিত্রও জাতকে পাওয়া যায়। অপরাধীর বিচার কীভাবে করা হতো, কীভাবে শাস্তি প্রদান করা হতো, কারা শাস্তি প্রদান করতেন তার উল্লেখ আছে জাতকে। জাতক পাঠে প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় বিশ্বাস, পূজা, যাগযজ্ঞ, আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার প্রভৃতি সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা যায়। শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল জাতকে তার বর্ণনাও পাওয়া যায়। ছাত্ররা কী কী বিষয় অধ্যয়ন করতেন, শিক্ষক কীভাবে পাঠদান করতেন তার উল্লেখ আছে জাতকে। এছাড়া বুদ্ধের সময়ের সমাজের নারীদের শিক্ষাদীক্ষার কথাও জাতক থেকে জানা যায়। এসব আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, জাতক ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ। সুতরাং জাতকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

তালিকা তৈরি: জাতকে ঐতিহাসিক কী কী তথ্য আছে তার একটি তালিকা তৈরি করো-

সিংহচর্ম জাতক

অতীতকালে বারাণসীতে রাজা ব্রহ্মদত্ত রাজত্ব করতেন। সে সময় বোধিসত্ত্ব এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্ষেতে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। স্ত্রী সন্তানসহ একটি মাটির ঘরে বসবাস করতেন। ক্ষেতের ফসল বাজারে বিক্রি করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে সুখে সংসার করছিলেন। একদিন সে গ্রামে এক বণিক এলো। তার সঙ্গে ছিল একটি গাধা। গাধার পিঠে পণ্য ও মালামাল নিয়ে বণিক গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় পণ্য বিক্রি করত। একসময় গ্রামের একটি গাছের নিচে সে বসবাস শুরু করল। নিজে রান্না করে খেলেও গাধার খাবারের ব্যবস্থা কীভাবে হবে তা নিয়ে বণিক চিন্তিত থাকতো।

একদিন বণিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে একটি সিংহের চামড়া কুড়িয়ে পেল। সিংহের চামড়া পেয়ে বণিকের মনে দুষ্ট বুদ্ধির উদ্ভব হলো। সে ভাবল, "ভালোই হলো। গাধাকে সিংহের চামড়া পরিয়ে কৃষকের শস্যক্ষেতে গাধাটিকে ছেড়ে দেবো। কৃষকেরা দেখে গাধাটিকে সিংহ মনে করবে। ভয়ে তারা কাছে আসবে না। গাধা পেট ভরে খেতে পারবে। গাধার খাবার নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না।"

যে কথা সে কাজ। বণিক মালামাল বিক্রি করার জন্য গ্রামের যেখানেই যেতেন গাধার খিদে পেলে সে প্রায়ই শস্যক্ষেতে ছেড়ে দিত। গাধা পেটপুরে শস্য খেতো। এতে কৃষকদের ফসল নষ্ট হতে লাগল; কিন্তু তারা সিংহের ভয়ে কাছে আসার সাহস পেত না। ফলে দিন দিন গ্রামের কৃষকদের ক্ষতি হতে লাগল। চাষিদের দুঃখের সীমা ছিল না। অন্যদিকে বণিক এসব কাজ করে ভীষণ মজা পেত।

একদিন বণিক গাধাকে একটি যবের ক্ষেতে ছেড়ে দিল। যব ক্ষেতের মালিক তার ক্ষেতে সিংহ দেখে খুব ভয় পেলেন। প্রাণীটিকে তাড়া করতে তার সাহস হলো না। কৃষক ভাবল সিংহের সামনে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। কৃষক ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। কৃষকের চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষ সেখানে ছুটে আসেন। অনেকে সাথে করে লাঠিসোটাও নিয়ে আসেন। মানুষের চিৎকার শুনে গাধাটি ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। প্রাণের ভয়ে গাধা তখন নিজের সুরে বিকট শব্দে ডাকতে লাগল। গাধার শব্দ শুনে সবাই অবাক হলো।

কৃষক বোধিসত্ত্বও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শব্দ শুনে বললেন, "এটি সিংহের ডাক নয়; গাধার ডাক। সুতরাং এটি কখনো সিংহ হতে পারে না।" তিনি আরো বললেন, "সিংহ তো তৃণভোজী নয় যে তৃণ খাওয়ার জন্য ক্ষেতে ক্ষেতে বিচরণ করবে; এটি নিশ্চয় একটি গাধা। গাধাটি সিংহ চর্ম দিয়ে তার দেহ ঢেকে রেখেছে।" গ্রামবাসী বোধিসত্ত্বের কথা শুনে গাধাটিকে ধরে ফেললো। তার গায়ে থাকা সিংহচর্ম খুলে নিলো। গাধার মালিক দুঃশীল বণিককে ডেকে ফসলের ক্ষতি করার অপরাধে বিচার করা হলো। বণিকের শাস্তি হলো। বিচারে তার জরিমানা হলো।

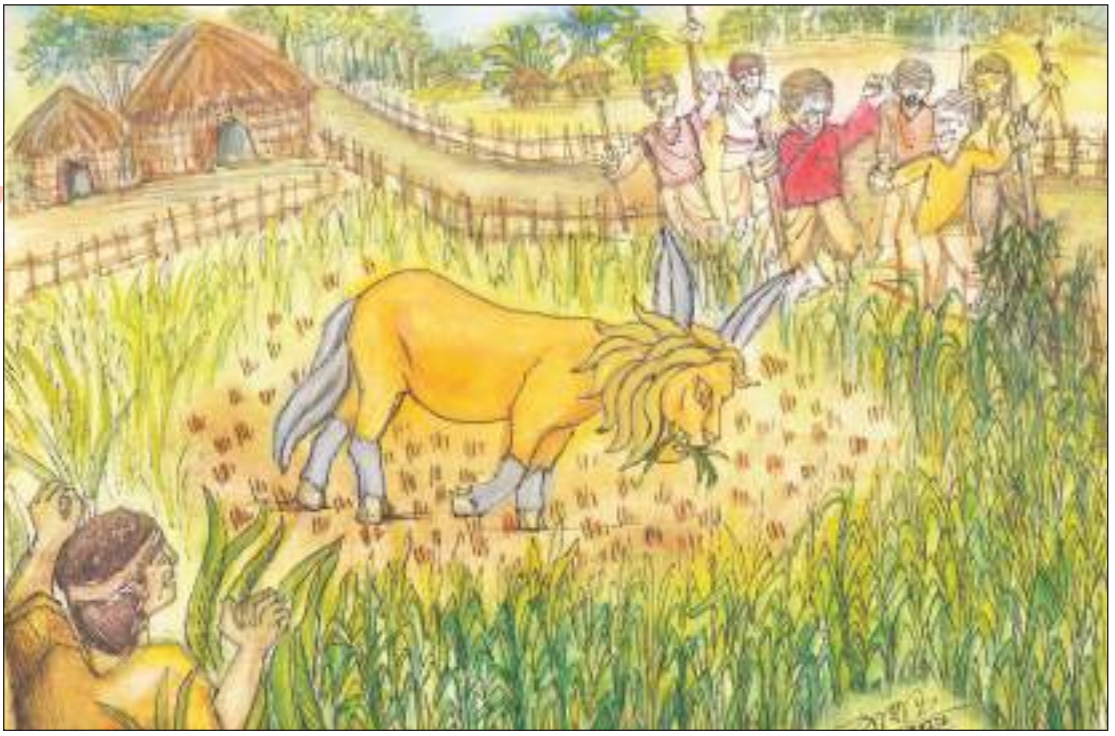

চিত্র ৩৩: সিংহরূপে ছদ্মবেশী গাধা ও গ্রামবাসী

জাতকটি পড়ে আমরা বুঝলাম খারাপ কাজের ফল কখনো ভালো হয় না। যে যেরকম কর্ম করে সে সেরকম ফল ভোগ করে। ছলচাতুরি করা ভালো নয়। প্রতারণা এবং মিথ্যার আশ্রয় নিলে তার পরিণতি ভোগ করতে হয়।

উপদেশ: প্রতারণা করার ফল শুভ হয় না।

একক কাজ: সিংহচর্ম জাতকটি পড়ে খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে কী জানলে লেখো-

মহাকপি জাতক

অতীতে বারাণসীতে রাজা ব্রহ্মদত্ত রাজত্ব করতেন। সেসময় বোধিসত্ত্ব বানরকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক শক্তিশালী ছিলেন। আশি হাজার বানরের প্রধান হয়ে হিমবন্ত প্রদেশে বসবাস করতেন।

সেসময় গঙ্গাতীরে বহুশাখা বিশিষ্ট একটা আম গাছ ছিল। গাছটিতে খুব সুস্বাদু, রসালো এবং বড়ো বড়ো আম হতো। গাছটির একটি শাখার ফল পড়তো মাটিতে, দুইটি শাখার ফল পড়তো গাছের গোড়ার কাছে আর একটি শাখার ফল পড়তো গঙ্গা নদীর জলে।

বোধিসত্ত্ব তার বানর সঙ্গীদের নিয়ে আম খাওয়ার সময় ভাবলেন এই গাছটির ফল যদি কখনো গঙ্গানদীর জলে পড়ে তখন বিপদ হতে পারে। তাই তিনি সেই শাখাটিতে একটা আমও রাখতেন না। সেই শাখায় আম পাকার আগেই বানরদের দ্বারা তা ছিঁড়ে ফেলতেন।

কিন্তু একবার সেই শাখাটিতে ভুলবশত একটা আম থেকে গেল। বানররা সেটি দেখতে পায়নি। আমটি একসময় পেকে নদীতে পড়ে যায় এবং নদীর স্রোতে ভেসে যায়।

বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত নদীর দুইদিকে জাল বেঁধে নদীতে জলক্রীড়া (সাঁতার) করছিলেন। এমন সময় সেই আমটি ভাসতে ভাসতে রাজার জালে আটকে গেল। নদী থেকে রাজপ্রাসাদে ফেরার সময় জেলেরা জাল তুলতে গিয়ে সে আমটি দেখতে পেলো; কিন্তু জেলেরা জানতো না যে ফলটির নাম কি। তারা ফলটি রাজাকে দেখালো, রাজাও জানতেন না সে ফলের নাম কি। রাজা তখন জেলেদের জিজ্ঞেস করলো, এ ফলের নাম কারা জানতে পারে? জেলেরা বললো, যারা বনে বনে ঘুরে বেড়ায় তারা জানতে পারে।

তখন রাজা বনচরদের ডেকে পাঠালেন। বনচরদের কাছ থেকে রাজা জানতে পারল যে ফলটির নাম আম। তখন রাজা ফলটি কেটে নিজে খেলেন, বনচরদের খাওয়ালেন এবং রাজপ্রাসাদের আরো অনেককে খাওয়ালেন। আমটি ছিল অত্যন্ত সুস্বাদু। আম খেয়ে রাজার মন জুড়ালো। তাই তিনি বনচরদের কাছে জানতে চাইলেন, এই আমের গাছ কোথায় পাওয়া যায়। তারা বললো - হিমবন্ত প্রদেশের নদীর তীরে পাওয়া যায়।

তখন রাজা বহু নৌকা নিয়ে নদী দিয়ে চলতে লাগলেন। এভাবে বহুদিন চলতে চলতে একদিন সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন। তারপর রাজা নৌকাগুলো নদীর তীরে রেখে তার সেনাদের সাথে নিয়ে সেই আম গাছের কাছে গেলেন। আম গাছের নিচে রাজা তার বিছানা প্রস্তুত করালেন এবং নানা ধরনের সুস্বাদু ফল খেয়ে সেখানেই শুয়ে পড়লেন। তিনি সেখানে আগুন জ্বালালেন এবং চারিদিকে তার সেনাদের পাহারা দিতে বললেন।

গভীর রাতে যখন রাজা এবং তার সেনারা ঘুমিয়ে পড়ল তখন বোধিসত্ত্ব তার সঙ্গী বানরদের নিয়ে সেখানে আসলো ফল খেতে। আশি হাজার বানর তখন গাছের এই ডাল থেকে সেই ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে ফল খেতে লাগলো। তাদের লাফানোর শব্দে রাজার ঘুম ভেঙে গেল। তখন রাজা তার সেনাদের বললেন যাতে এই বানরেরা পালাতে না পারে। কেননা, রাজা আম ফলের সাথে সাথে এই বানরদেরও খাবেন। সেনারা রাজার কথামতো বানরদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল। এটি দেখে বানরেরা

ভয়ে কাঁদতে লাগলো। তারা পালানোর চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। অবশেষে তারা বোধিসত্ত্বের কাছে গেল সাহায্যের জন্য। বোধিসত্ত্ব তাদের বললেন - তোমাদের কোনো ভয় নেই আমি তোমাদের প্রাণ বাঁচাবো।

আম গাছটির একটি শাখা বাঁকাভাবে ছিল, সেই শাখাটি দিয়ে বোধিসত্ত্ব নদীর দিকের শাখাটিতে গেলেন। তারপর সেখান থেকে জোরে লাফ দিয়ে নদীর অপর পাড়ে একটা গাছে পড়লেন। তারপর তিনি মনে মনে হিসাব করলেন, নদীর এ পাড় থেকে ঐ পাড়ের দূরত্ব কতো।

এরপর তিনি একটি গাছের ছাল ছাড়ালেন, যাতে সেই ছাল দিয়ে বানরেরা নদী পার হয়ে অন্য তীরে যেতে পারে। তারপর তিনি হিসাব করলেন যে, তার কি পরিমাণ ছাল লাগবে। তারপর তিনি মাপ নিলেন এভাবে যে, এক প্রান্ত গাছে বাঁধা থাকবে, অপর প্রান্তটি মাঝখানে দূরত্ব থাকবে। এই পরিমাণ গাছের ছাল তিনি নিলেন; কিন্তু তার কোমরে বাঁধতে যে পরিমাণ ছাল লাগবে সেটি তিনি হিসাব করতে ভুলে গেলেন।

তারপর তিনি ছাল দিয়ে নদীর তীরের একটি গাছে শক্ত করে বাঁধলেন এবং এক অংশ দিয়ে নিজের কোমরে বাঁধলেন। তারপর তিনি আবার লাফ দিয়ে সেই আম গাছের কাছে গেলেন; কিন্তু তখন দেখতে পেলেন যে আরো কিছু পরিমাণ গাছের ছাল সেখানে লাগতো। তারপর সেই ফাঁকা অংশে তিনি নিজেই শুয়ে পড়লেন এবং সকল বানরকে তার পিঠে পা দিয়ে পার হয়ে যেতে বললেন।

চিত্র ৩৪: মহাকপি তার সঙ্গী বানরদের রক্ষা করছেন

বানরেরা সবাই একে একে পার হয়ে গেল; কিন্তু শেষে ছিল দেবদত্ত। দেবদত্তও সেসময় বানররূপে জন্ম নিয়েছিল এবং সেই আশিহাজার বানরের মধ্যে তিনিও ছিলেন। দেবদত্ত ভাবলো বোধিসত্ত্বকে মেরে ফেলার এটাই সুযোগ। তাই তিনি অনেক দূর থেকে ছুটে এসে বোধিসত্ত্বের পিঠের উপর পা দিয়ে পার হয়ে গেলেন। এদিকে বোধিসত্ত্ব হৃৎপিন্ডে প্রচন্ড আঘাত পেল এবং তিনি অনেক কষ্ট পেলেন। বোধিসত্ত্ব সেখানে তখন একাই থাকলেন।

এসব দেখে রাজা ভাবলেন বানরকুলে জন্মগ্রহণ করেও এই বানররাজা নিজের প্রাণের কথা না ভেবে অন্যের উপকার করলেন। তারপর বোধিসত্ত্বের উপর রাজার মায়া হলো। তিনি তাকে গাছের ডাল থেকে নামালেন এবং অনেক সেবা-যত্ন করে সুস্থ করার চেষ্টা করলেন।

রাজা তখন বোধিসত্ত্বকে বললেন- কেন তুমি নিজের জীবনের কথা না ভেবে তাদের সাহায্য করলে, তারা তোমার কে হয়? বোধিসত্ত্ব তখন বললেন, বানরদের রাজা আমি, তারা বিপদে পড়েছিল এবং ভয়ে কাঁপছিল, তাদেরকে বাঁচানো আমার কর্তব্য। তাদের জন্য আমার জীবন গেলেও আমার তাতে কোনো কষ্ট নেই। তারপর বোধিসত্ত্ব মারা গেলেন। রাজা তখন খুব সম্মানের সাথে বোধিসত্ত্বের দেহের সৎকার করলেন। অবশেষে রাজা তাঁর রাজ্যে ফিরে আসলেন এবং সাথে নিয়ে আসলেন বোধিসত্ত্বের দেহাবশেষ বা অস্থি। সেই অস্থিকে রাজা সাত দিন ধরে পূজা করলেন। অস্থির উপর একটি চৈত্য তৈরি করালেন। এভাবে যতদিন রাজা বেঁচে ছিলেন ততদিন চৈত্যের পূজা করতেন। বোধিসত্ত্বের প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে রাজ্য পরিচালনা করতেন। প্রজাদের জন্য ভালো কাজ করতেন। একসময় রাজাও মারা গিয়ে স্বর্গলাভ করেন।

উপদেশ: পরোপকারিতাই পরম ধর্ম।

একক কাজ: তুমি কি কখনো কারো উপকার করেছো? কীভাবে সে উপকার করেছিল? সে ঘটনা বর্ণনা করো-

বানরেন্দ্র জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একবার বানররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তিনি একাকী এক নদীর তীরে বিচরণ করতেন। নদীর অপর পাড়ে ছিল একটি আম-কাঁঠালের দ্বীপ। বোধিসত্ত্ব যে নদীর তীরে থাকতেন, সে নদীর মাঝখানে একটি বড়ো পাথর খণ্ড ছিল। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন নদীর তীর থেকে এক লাফে ঐ পাথর খণ্ডের উপর এবং সেখান থেকে এক লাফে দ্বীপে গিয়ে পড়তেন। সেই দ্বীপে তিনি পেটভরে আম-কাঁঠাল খেয়ে সন্ধ্যার সময় ঠিক একইভাবে নদী পার হয়ে ফিরে আসতেন।

ওই নদীতে এক কুমির তার স্ত্রীকে নিয়ে বাস করত। বোধিসত্ত্বকে প্রতিদিন নদী পারাপার হতে দেখে কুমিরের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর তাঁর হৃৎপিণ্ড খাওয়ার ইচ্ছা হলো। সে তার সাধের কথা কুমিরকে জানালো। স্ত্রীর ইচ্ছা পূরণের জন্য কুমির সন্ধ্যার সময় বোধিসত্ত্বকে ধরার জন্য ঐ পাথর খণ্ডের উপর উঠে বসে থাকল।

বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ফেরার আগে নদীর জল কতদূর বাড়ল, পাথর খণ্ড পানির উপর কতটুকু জেগে থাকল তা মনোযোগ সহকারে দেখে নিতেন। সেদিন সারাদিন বিচরণ করে সন্ধ্যাকালে পাথর খণ্ডের দিকে তাকিয়ে তিনি অবাক হলেন। তিনি লক্ষ করলেন, নদীর জল বাড়েওনি কমেওনি, অথচ পাথরের উপরিভাগ উঁচু হয়ে আছে। তাঁর মনে সন্দেহ হলো। নিশ্চয় তাঁকে ধরার জন্য কুমির পাথরের উপর উঠে বসে আছে। তিনি বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে চিৎকার করে পাথর খণ্ডকে ডাকতে থাকলেন, 'ওহে পাথর খণ্ড'! কোনো উত্তর না পেয়ে আবার ডাকলেন। এতেও কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি বললেন, ভাই পাথর খণ্ড, আজ কোনো উত্তর দিচ্ছ না কেন?

কুমির ভাবল, এই পাথর খণ্ড নিশ্চয় প্রতিদিন বানরের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। আজ আমি পাথররের পরিবর্তে সাড়া দিই। তখন সে উত্তরে বলল, কে বানরেন্দ্র নাকি?

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে উত্তর দিল, আমি কুমির।

- তুমি পাথরের উপর বসে আছ কেন?
- আমার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর তোমার হৃৎপিণ্ড খাওয়ার সাধ হয়েছে। তাই তোমাকে ধরতে বসে আছি।
- কুমির ভাই, আমি তোমাকে ধরা দিচ্ছি। তুমি হাঁ করো, আমি তোমার মুখের ভিতর লাফিয়ে পড়ছি। তখন তুমি আমায় ধরতে পারবে।

কুমির যখন মুখ হা করে, তখন তার দুচোখ দিয়ে কিছুই দেখতে পায় না। বোধিসত্ত্ব কৌশলে নিজের জীবন রক্ষা করতে চেষ্টা করছিলেন, কুমির তা বুঝতে পারেনি। সে বোধিসত্ত্বের কথামতো মুখ হা করে চোখ বন্ধ করে রইল। এ অবস্থায় বোধিসত্ত্ব এক লাফে তার মাথার উপর এবং আরেক লাফে খুব দ্রুতগতিতে নদীর ওপারে পৌঁছে গেলেন। কুমির এই কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে বানরের উদ্দেশে বলল, 'বানরেন্দ্র' চারটি গুণ থাকলে সব শত্রুকে জয় করা যায়। সে চারটি গুণ হলো সত্য, ধৈর্য, ত্যাগ আর বিচক্ষণতা। তোমার মধ্যে এই চারটি গুণই আছে। তোমাকে 'নমস্কার'। এভাবে বানররূপী বোধিসত্ত্বের প্রশংসা করে কুমির চলে গেল।

চিত্র ৩৫: বানর বুদ্ধি দিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করল

উপদেশ: ধৈর্য ও বুদ্ধি দিয়ে বিপদের মোকাবিলা করতে হয়।

একক কাজ: তোমার জীবনে ঘটে যাওয়া বিপদ থেকে নিজ বুদ্ধি দিয়ে কীভাবে রক্ষা পেয়েছ, সে ঘটনা বর্ণনা করো-

জাতকের শিক্ষায় প্রকৃতি ও জীবজগতের সুরক্ষা

প্রকৃতি ও জীবজগৎ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। মানুষের জীবিকা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে প্রকৃতির

উপর। তাই প্রকৃতি ও পরিবেশের সুরক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। কেননা প্রকৃতি ভালো থাকলে, ভালো থাকবে জীবজগৎ। ভালো থাকবে মানুষ। তথাগত বুদ্ধের জীবন ইতিহাস থেকে আমরা প্রকৃতি ও জীবজগতের সুরক্ষায় নানান শিক্ষা পেয়ে থাকি। গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ, ধর্মপ্রচার, মহাপরিনির্বাণ প্রভৃতি ঘটনার সাথে প্রকৃতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। লুম্বিনী কাননের প্রাকৃতিক পরিবেশে শালবৃক্ষের তলে সিদ্ধার্থের জন্ম। বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষের নিচে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। কুশিনগরে 'যমক শাল' বৃক্ষের নিচে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তাঁর বাণী, 'জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক' বিশ্বপ্রকৃতির সকল প্রাণীর নিরাপত্তা ও বাঁচার অধিকার ঘোষণা করে। তাঁর ধর্ম প্রচারের প্রথম থেকেই প্রকৃতি ও পরিবেশের বহু উপাদানের উপস্থিতি দেখা যায়। বিনয় পিটকে বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের প্রতি গাছ কাটতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। সংযুক্ত নিকায়ের 'বনরূপা সূত্রে' বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে গাছ লাগাতে এবং বনায়ন সৃষ্টিতে উৎসাহিত করেন। 'চক্রবর্তী সূত্রে' বুদ্ধ আদর্শ রাজার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে দেশনা করেন-একজন আদর্শ রাজা কেবল তাঁর প্রজার রক্ষক নন, তিনি বন, প্রাণী ও পক্ষিকুলেরও আদর্শ রক্ষক। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় বুদ্ধ কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ও মগধের রাজা বিম্বিসারকে মহান রক্ষকের ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁরই ফলশ্রুতিতে মগধের রাজা বিম্বিসার রাজ্যে নিরীহ পশু হত্যার মাধ্যমে যজ্ঞপ্রথা নিষিদ্ধ করেন।

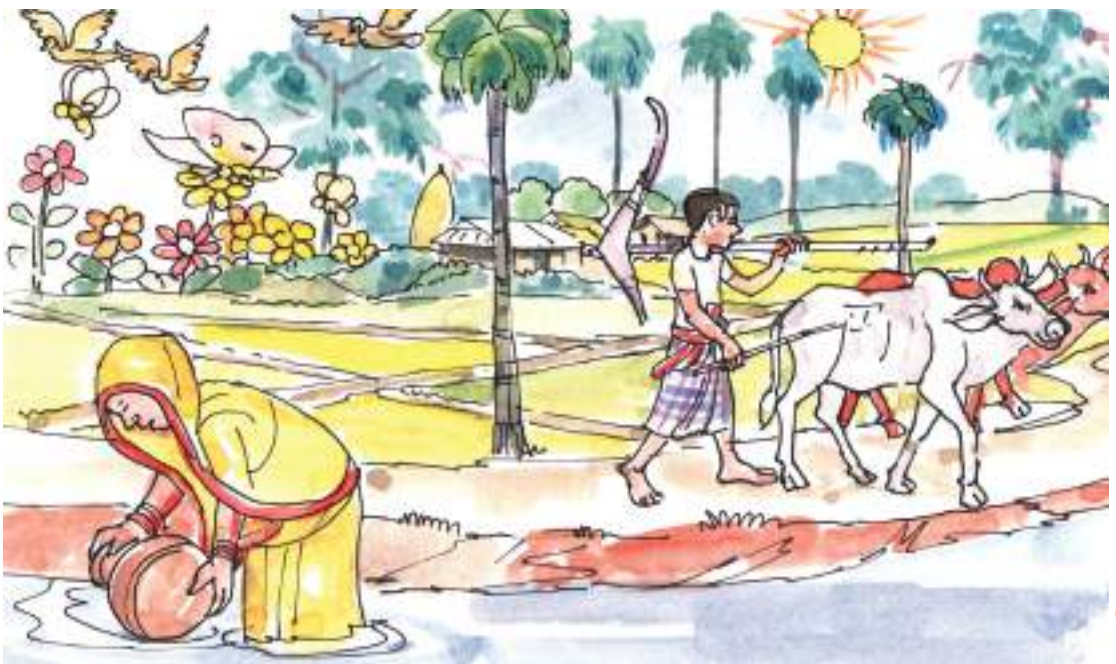

চিত্র ৩৬: জীব ও প্রকৃতি

জাতক পাঠের মাধ্যমে আমরা প্রকৃতি ও জীব জগতের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, তা জানতে পারি। জাতকের কাহিনিতে জীব ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের শিক্ষা পাওয়া যায়। এছাড়া জাতকে জীবজগৎ ও প্রকৃতির সুরক্ষায় আমাদের করণীয় বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। সিংহচর্ম জাতক পাঠ করে আমরা জানতে পারি, প্রতারণা বা দুষ্ট কাজের ফল কখনো শুভ হয় না। প্রকৃতির

মাঝে জীবন ধারণের প্রয়োজনীর খাদ্য, ঔষধি উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে। মানুষ চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জায়গাগুলো বিনষ্ট করা উচিত নয়। ব্যক্তিগত অতিরিক্ত লাভের জন্য সে প্রকৃতিকে বিনষ্ট করলে তার খারাপ ফলও ভোগ করতে হয়। মহাকপি জাতক আমাদের শেখায়, সকল জীব প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। পশুপাখি যেমন প্রকৃতি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে মানুষও জীবনধারণের সব উপাদান প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করে। প্রকৃতির উপকরণগুলো সকলে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে কখনো নিজেদের মধ্যে অসুবিধা হয় না। প্রকৃতির দান ভোগ করার ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। অন্যের জন্য প্রকৃতির সে দান পর্যাপ্ত রাখছি কিনা, তাও আমাদের দেখা আবশ্যক। পরস্পরের উপকারে আমাদের কাজ করা উচিত। জীবজগৎ, প্রকৃতি-পরিবেশ সকলের কল্যাণে বা উপকারে কাজ করলে পৃথিবী বাসযোগ্য হবে। বানরেন্দ্র জাতক থেকে আমরা- ধৈর্য ও বুদ্ধি দিয়ে কীভাবে বিপদের মোকাবিলা করতে হয়, তার শিক্ষা পাই। নানা বিপদ ও দুর্যোগ থেকে আমরা এই জাতকের উপদেশ অনুসারে রক্ষা পেতে পারি। অক্সিজেন, পানি, সৌরতাপ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। উদ্ভিদ অক্সিজেন দেয় এবং কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে। উদ্ভিদ মানুষের পরম বন্ধু। সুতরাং প্রকৃতির কোনো কিছু নির্বিচারে ধ্বংস করা উচিত নয়। প্রত্যেকের কর্তব্য প্রকৃতি ও পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

ধারণা চিত্র: সঠিক শব্দ দিয়ে বৃত্ত পূরণ করো

কীভাবে প্রকৃতি ও জীব জগৎকে ভালোবাসতে পারো–

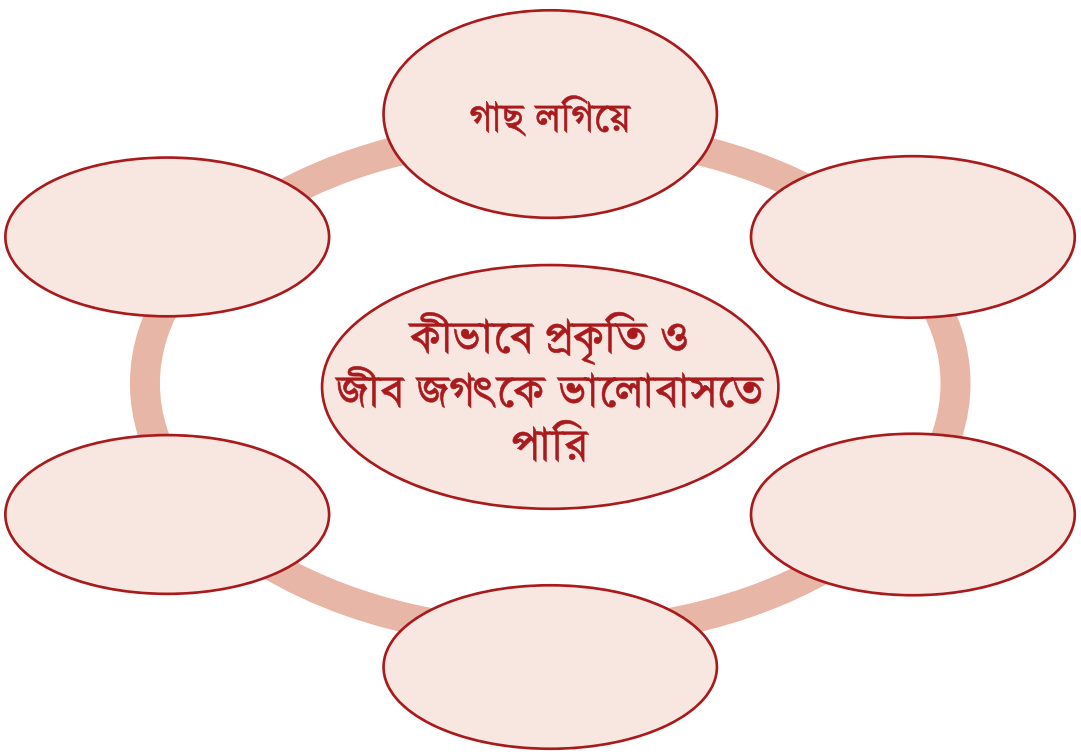

পোস্টার পেপার প্রদর্শন: তোমার এলাকায় প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি কীভাবে যত্নশীল হবে, তা পোস্টার পেপারে লিখে প্রদর্শন করো-

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিই:

১। বুদ্ধ জাতকের কাহিনিগুলো কেন বলতেন?
ক) ভালো-মন্দ কাজের সুফল ও কুফল বুঝানোর জন্য খ) ভালো কাজের সুফল বুঝানোর জন্য
গ) মন্দ কাজের কুফল বুঝানোর জন্য ঘ) মন্দ কাজে উৎসাহিত করার জন্য

২। জাতকে গৌতম বুদ্ধের কোন জীবনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে?
ক) ভবিষ্যৎ খ) বর্তমান গ) অতীত ঘ) বর্তমান-ভবিষ্যৎ

৩। জাতকের সংখ্যা কয়টি?
ক) ৫৬০টি খ) ৫৫০টি গ) ৫৫১টি ঘ) ৫০১টি

৪। সিংহচর্ম জাতকে বণিককে সাহায্যকারী প্রাণীর নাম কী?
ক) ঘোড়া খ) কুকুর গ) গরু ঘ) গাধা

৫। বানরেন্দ্র জাতকে বানরের কয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে?
ক) চারটি খ) দুটি গ) পাঁচটি ঘ) সাতটি

খ) শূন্যস্থান পূরণ করি:

১। জাতক _____ পিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের গ্রন্থ।

২। আদর্শবান ব্যক্তিকে সবাই _____ করে।

৩। প্রাচীন ভারত _____ রাজ্যে বিভক্ত ছিলো।

৪। সিংহচর্ম জাতকে বোধিসত্ত্ব _____ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

৫। ধৈর্য ও বুদ্ধি দিয়ে _____ মোকাবিলা করতে হয়।

গ. মিল করি:

বাম পাশ	ডান পাশ
১। গৌতম বুদ্ধ ধর্মদেশনার সময় শিষ্য ও শ্রোতাদের উদ্দেশে	ক) গ্রামের নানান জায়গায় পণ্য বিক্রি করত।
২। জাতক	খ) নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠনের শিক্ষা দিতেন।
৩। বুদ্ধ জাতকের মাধ্যমে	গ) পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।
৪। গাধার পিঠে পণ্য ও মালামাল নিয়ে বণিক	ঘ) জাতকের কাহিনিগুলো বলতেন।
৫। প্রকৃতি ও জীবজগৎ	ঙ) ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ।

ঘ. শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নির্ণয় করি:

১। জাতকের উপদেশ মানুষকে শীলবান, দয়াবান, নীতিবান হতে সাহায্য করে। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। মহাকপি জাতকে বোধিসত্ত্ব কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের প্রভাব অপরিসীম। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। বানরেন্দ্র জাতক থেকে আমরা শিক্ষা পাই 'একতাই শক্তি'। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। জাতকে জীব ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের শিক্ষা পাওয়া যায়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। জাতক কাকে বলে?

২। নৈতিক জীবন গঠনে জাতকের ভূমিকা সংক্ষেপে লেখো।

৩। বানরেন্দ্র জাতকে বানররূপী বোধিসত্ত্বের কয়টি গুণের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সেগুলো কী কী?

৪। সিংহচর্ম জাতকে বণিক তার কাজের কী ফল পেয়েছিল?

৫। মহাকপি জাতকের শিক্ষা তুমি কীভাবে অনুসরণ করবে লেখো।

চ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১। জাতকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্ণনা করো।

২। সিংহচর্ম জাতকের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো।

৩। মহাকপি জাতকে বোধিসত্ত্ব কীভাবে সঙ্গীদের জীবন রক্ষা করেন?

৪। কীভাবে বিপদ মোকাবিলা করা যায়, বানরেন্দ্র জাতকের আলোকে বর্ণনা করো।

৫। জাতকের আলোকে প্রকৃতি ও জীবজগৎ সুরক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য, পঞ্চম শ্রেণি–বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

–গৌতম বুদ্ধ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য